ইসলামে নারী বনাম

ইয়াহূদী-খৃষ্টান ধর্মে নারী

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ড. শরীফ আব্দুল আযীম

অনুবাদ: মুহাম্মাদ ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المرأة في الإسلام والمرأة في العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقة

د/ شريف عبد العظيم

ترجمة: محمد إسماعيل ذبيح الله

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	অনুবাদকের কথা	
২	ভূমিকা	
৩	হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরাধ?	
৪	হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরাধের উত্তরাধিকার	
৫	কন্যা সন্তান কি অপমান ডেকে আনে?	
৬	নারী শিক্ষা	
৭	ঋতুবতী নারী আশপাশের সব কিছুকে নাপাক করে দেয় কি?	
৮	সাক্ষ্যদানের অধিকার	
৯	ব্যভিচার	
১০	মানত করা	
১১	স্ত্রীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব	
১২	তালাক	
১৩	মা	
১৪	উত্তরাধীকার সম্পদে নারী	
১৫	বিধবার সমস্যাসংকুল জীবন	

১৬	বহুবিবাহ	
১৭	পর্দা বিধান	
১৮	শেষ কথা	
১৯	সহায়ক গ্রন্থাবলী	

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العلمين والصلاة و السلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم- أما بعد

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের সমাজের কিছু লোক ইসলামের নামে অনেক আজে বাজে কথা বলে, আরোপ করে বহু অভিযোগ। যার সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকলে তারা এমনটি করত না। তাদের এই হীনতর কাজের একটি ক্ষেত্র হচ্ছে নারীর অধিকার। তারা বলতে চায় ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ বলে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক। ইসলাম পুরুষকে চারটি বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, অথচ নারীকে একটির বেশি অনুমতি দেয় নি। এখানেও নাকি নারীকে ঠকানো হয়েছে ইত্যাদি। এরূপ হাজারো অভিযোগ।

আচ্ছা! তারা কি কখনো এগুলোর পিছনের মূল কারণগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে? কেন নারীকে পুরুষের অর্ধেক

অংশ দেওয়া হলো? সব সময়ই কি নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক? তারা যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তারা দেখতে পাবে এর মধ্যে বিদ্যমান ন্যায় ও ইনসাফের অনন্য দৃষ্টান্ত। যেমন, উত্তরাধীকার সম্পদ নিয়ে আলোচনা করি। নারীকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারের কোনো খরচের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। শ্বশুর বাড়ীতে তার আত্মীয়-স্বজন আসলেও তাদের আপ্যায়নের জন্য তার একটি কড়িও খরচ করতে হয় না। সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের খরচ তার করা লাগে না । এসব কিছুর দায়িত্ব স্বামীর। সুতরাং সে যেটুকু পায় তার সবই থেকে যায়। সবই আয়। কোনো ব্যয় নেই। পক্ষান্তরে, পরিবারের সার্বিক ব্যয়ভার স্বামীকে বহন করতে হয়। স্ত্রী যদি কোটিপতিও হয়, তবুও তার ওপর তার নিজের খরচের কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় নি, বরং তার খরচ চালানোর দায়িত্বও স্বামীর ওপর ন্যস্ত। অপরদিকে, পুরুষেরা সাধারণত চারটি জায়গা থেকে উত্তরাধিকার সম্পদ পায়। পক্ষান্তরে নারীরা পায় ৮/৯ জায়গা থেকে। তাছাড়া সব সময় তারা পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পায় না; বরং কোনো কোনো জায়গায় তারা পুরুষের

সমান পায় আবার কোনো কোনো জায়গায় পুরুষ পায়ই না, তার স্থলে একই পর্যায়ের নারী থাকলে সে সম্পদ পায়। গড় হিসাব করতে গেলে তারা পুরুষের সমান, বরং পুরুষের চেয়ে বেশি পায়।

আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় পর্দা। এটা ইসলামের বানানো জিনিস নয়, বরং ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মেও পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বইয়ে ইসলাম ধর্ম, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মে নারীদের অবস্থান ও মর্যাদার চিত্র এবং বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি পাঠকবৃন্দ এ বই থেকে তিনটি ধর্মে বর্ণিত নারীদের অধিকার ও মর্যাদার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা জানতে পারবেন। পরিশেষে, সকল মুসলিম ভাই বোনের কাছে দো'আ চাচ্ছি, আল্লাহ যেন আমাকে কল্যাণকর গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে মুসলিম জনগোষ্ঠির দুয়ারে সহজভাবে পৌছে দেওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ইসমাইল যাবীহুল্লাহ

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর
তাং ১৬ মার্চ ২০১০ ইং

ভূমিকা

পাঁচ বছর ধরে আমি ‘টরেন্টো স্টার’ পত্রিকা পড়ছি। ১৯৯০ সালের ৩ জুলাই গুইন ডায়েরের লেখা একটা প্রবন্ধ পেলাম। শিরোনাম ‘শুধু ইসলামই ঐশ্বরিক মতবাদ নয়’। বিশিষ্ট মিশরীয় নারীবাদী গবেষক ড. নাওয়াল আস-সা‘দায়ীর মন্তব্যের বিপক্ষে মন্ট্রিয়ালে অনুষ্ঠিত “নারী ও ক্ষমতা’ শীর্ষক কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের কার্যক্রমের জবাবে এটা লেখা হয়েছে। তার কমেন্ট ছিল রাজনৈতিকভাবে ভুল। ‘নারী সংক্রান্ত সকল শিক্ষা ইয়াহূদী ধর্মে পাওয়া যেত তারপর তা খৃষ্টান ধর্ম এবং পরবর্তীতে আল-কুরআনে পাওয়া যায়” এবং “সকল ঐশ্বরিক ধর্ম ঐশ্বরিক সমাজে উদ্ভাবিত হয়েছে।’ হিজাবের বিধান শুধুমাত্র ইসলামেই আসে নি” বরং তা পুরাতন যুগের ধর্মগুলোতেও পাওয়া যেত।

অংশগ্রহণকারীরা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের সাথে একই কাতারে মেনে নিতে চায় নি। এজন্যই ড. নাওয়াল সা'দায়ী তাদের প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার হন। বিশ্ব মাতৃদের আন্দোলনের প্রিন্স দুবো বললেন: সা'দায়ীর মতামত অগ্রহণযোগ্য। তিনি অন্যান্য ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। ইসরাঈলের নারীবাদী সংগঠনের 'আলেস শ্যালভী' বলেন, "আমাদের অবশ্য কর্তব্য তার কথার বিরোধিতা করা। কারণ, ইয়াহূদী ধর্মে কোনো হিজাব নেই।" এ প্রবন্ধে বলা হয় পশ্চিমাদের ইসলামের উওপর অপবাদ আরোপই পশ্চিমা সভ্যতার বিভিন্ন কার্যক্রমের স্রষ্টা।

গুইন ডায়ের আরও বলেন, "ইয়াহূদী ও খৃষ্টান নারী অধিকার আন্দোলনকারীরা মুসলিমদেরকে কখনো তাদের সমান মেনে নেবে না।"

কনফারেন্সে উপস্থিত সদস্যদের অবস্থান; বিশেষ করে নারী সংক্রান্ত অবস্থান আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয় নি। কারণ, পশ্চিমাদের কাছে ইসলাম 'নারীর

ওপর যুলুমকারী ধর্ম’ বলেই বিবেচিত হয়। এর সবচেয়ে বড় দলীল হচ্ছে ভোল্টায়ারের দেশ ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী ফ্রান্সের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে হিজাব পরিহিতা নারীদেরকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন![1]

এছাড়া যখন কোনো খৃষ্টান ছাত্র ক্রুশ ঝুলিয়ে এবং কোনো ইয়াহূদী ছাত্র তাদের নিজস্ব টুপি পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার সুযোগ পেয়েছিল তখন মুসলিম নারীরা তাদের হিজাব ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফ্রান্সের পুলিশ কর্তৃক হিজাব পরিহিতা নারীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশে বাধা প্রদানের দৃশ্য ভুলে যাওয়ার মতো নয়। এটা ‘আলাবামা’ প্রদেশের শাসক জর্জ ওয়ালাসের অপমানকর ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৬২ সালে তিনি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে দুই ঘটনার মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে। কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররা আমেরিকানসহ সারা বিশ্বের সহানুভূতি অর্জন করার

[1] The globe and mail, oct. 4, 1994

ফলে ‘প্রেসিডেন্ট কেনেডী’ তাদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করাতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। আর মুসলিম নারীরা কারও কাছ থেকে কোনো ধরণের সহযোগিতা পায় নি। ফ্রান্সের ভিতর বা বাইরে থেকেও তারা কোনো সহানুভূতি পায় নি। এটার কারণ হলো, ইসলাম সম্বন্ধে তাদের মধ্যকার ভূল বুঝাবুঝি ও ইসলাম সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের প্রতি ভীতি, তবে আমার সব মনযোগ কেড়ে নিয়েছে “ড. সা‘দায়ীর বক্তব্য ও অন্যদের সমালোচনা।” অন্য কথায়, নারীদের এ বিধান কি ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও ইসলাম সব ধর্মে একই রকম? নাকি তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে? ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম কি ইসলামের চেয়ে নারীদেরকে বেশি মর্যাদা দিয়েছে? আসল ঘটনাটা কী?

নিশ্চয় এ প্রশ্নগুলোর জবাব সহজ ব্যাপার নয়। প্রথমত: কঠিন ব্যাপার যে, আমাকে নিরপেক্ষ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে; অন্ততঃপক্ষে সাধ্যমত তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছে সত্য কথা বলার

জন্য যদিও তা তাদের নিকটস্থ লোকদেরকে নাখোশ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١٥٢﴾ [الانعام: ١٥٢]

“যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়সংগত কথা বলবে যদিও তা তোমাদের নিকটাত্মীয় স্বজনের বিপক্ষে যায়। তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে নাও। তিনি তোমাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন;যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫২]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ﴾ [النساء: ١٣٥]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সংগত সাক্ষ্যদান কর, যদিও তা

তোমাদের নিজেদের, পিতামাতা বা নিকটাত্মীয় স্বজনদের বিপক্ষেও চলে যায়। যদি সে ধনী বা গরীব হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেয়েও তাদের অনেক বেশি শুভাকাংখী। অতএব, তোমরা ন্যায় বিচার করতে গিয়ে নিজেদের নাফসের কামনা বাসনার অনুসরণ করো না।" [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫]

আরেকটি কষ্টকর কাজ হলো এ বিষয়টা অনেক প্রশস্ত এবং এর শাখা প্রশাখা ব্যাপকবিস্তৃত। এ জন্য গত কয়েক বছর যাবত আমি বাইবেলসহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বকোষ ও ইয়াহূদী বিশ্বকোষ পড়াশুনা করেছি এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের ও সমালোচকদের লেখা পুস্তকাদি ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেছি। সামনের অধ্যায়গুলোতে আমি আমার গবেষণার সার সংক্ষেপ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

আমি সম্পূর্ণভাবে উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি নি এবং হওয়ার দাবিও করি না; বরং গবেষণার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুরআনের নির্দেশ অনুসারে

আমি এ বিষয়ে ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করেছি। এমন কোনো মুসলিম এ ধরায় পাওয়া যাবে না যে, মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল বলে বিশ্বাস করে না। আমার উদ্দেশ্য ছিল আমি ইসলামকে সর্বপ্রকার অপবাদ থেকে মুক্ত করব এবং আল্লাহ তা'আলা যেন আমার দ্বারা সর্বশেষ জীবনবিধান ইসলামের খেদমত করান। তাই তিনটি ধর্মে নারীদের মর্যাদা নিয়ে আমি মূল ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে রেফারেন্স নিয়ে এসেছি, অনেকের মতো অন্যের অনুসরণ করে পক্ষপাতমূলকভাবে নয়। এ জন্যই অধিকাংশ সুত্র এসেছে কুরআন, হাদীস, বাইবেল, তালমুদ এবং খৃষ্টান ধর্মের এমন কিছু পাদ্রীর বক্তব্য থেকে, যাদের বক্তব্য খৃষ্টান ধর্মে অনেক বড় স্থান দখল করে আছে। এ ধর্মসমুহের অনেকেরই স্বভাব হচ্ছে, তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের সঠিক শিক্ষা উপস্থাপন করতে চান না। অনেক মানুষ সভ্যতা ও ধর্মকে একাকার করে দেন। অনেকে আবার আসমানী কিতাবের কথা বুঝে উঠতে পারেন না।

আর কিছু লোক আসমানী কিতাবের নির্দেশের দিকে একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করে না।

হাওয়া আলাইহিস সালামের অপরাধ

তিনটি ধর্ম একটি সত্যের ওপর একমত, তা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। ধর্মগুলোর মধ্যে যত সব বৈপরিত্য হয়েছে সবই প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামের সৃষ্টির পর। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু সাপ হাওয়া আলাইহাস সালামকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায় প্ররোচনা দিয়েছে। আর হাওয়া আদম আলাইহিস সালামকে তা খেতে প্ররোচনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন আদম আলাইহিস সালামকে অপরাধের জন্য দোষারোপ করেছেন, তখন আদম আলাইহিস সালাম তার সব দোষ হাওয়াকে দিয়ে বলেছেন: "অতঃপর আদম আলাইহিস সালাম বললেন:

ঐ মহিলা আমাকে দিয়েছে তাই আমি তা খেয়েছি।” (জেনেসিস: ৩/১২)

স্রষ্টা মহিলাদের সম্পর্কে বললেন: “আমি তোমাদেরকে অনেক কষ্টের সন্মুখীন করব। সন্তান প্রসবের সময় ব্যাথা পাবে, আর তোমার সমস্ত মনোনিবেশ হবে তোমার স্বামীর দিকে। যে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে। আর তিনি আদম আলাইহিস সালামকে বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছ। যার সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর এ অভিশপ্ত গাছ থেকে ভক্ষণ করো না। এর কারণে দুঃখ-কষ্ট তোমার জীবনের দিনগুলোকে খেয়ে ফেলবে। (জেনেসিস: ৩/১৬-১৭)

অপর দিকে সৃষ্টির শুরুর ঘটনাবলী নিয়ে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩ فَوَسۡوَسَ لَهُمَا

ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [الاعراف: ١٩، ٢٣]

“হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে ঐ বৃক্ষের পাশে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যাবে। অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের গোপন অঙ্গসমূহ প্রকাশিত হয়। সে বলল: তোমরা উভয়ে ফিরিশতা কিংবা চিরকাল জান্নাতে বসবাসকারী হয়ে যাবে। এ জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে এ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন। সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল: অবশ্যই আমি তোমাদের হিতাকাংখী। অতঃপর

প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা ঐ গাছ থেকে আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলেন। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করি নি? আর আমি কি তোমাদেরকে বলে দেই নি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা উভয়ে বলল: হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব”। [সুরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯-২৩]

উপরোক্ত দু‘টি ঘটনার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমরা অনেক মৌলিক পার্থক্য দেখতে পাব। আল-কুরআন বাইবেলের বিপরীত যেখানে দোষারোপ করা হয়েছে আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম উভয়কেই। কুরআনের কোথাও বলা হয় নি যে, হাওয়া

আদম-কে গাছ থেকে খেতে প্রতারিত করেছেন বা তিনি আদম আলাইহিস সালামের আগেই তা খেয়েছেন।

সুতরাং কুরআন অনুযায়ী হাওয়া আদম আলাইহিস সালামকে প্রতারণা কিংবা বিপথে পরিচালিত করেন নি। আর গর্ভধারণের যন্ত্রণা মায়েদের ওপর আল্লাহ তা‘আলার শাস্তি নয়। কুরআনে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ তা‘আলা কারো অপরাধের কারণে অন্যকে শাস্তি দেন না। অতএব, আদম ও হাওয়া উভয়েই সমান অপরাধ করে আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরাধের উত্তরাধিকার

বাইবেলে বর্ণিত ‘হাওয়া আলাইহাস সালাম আদম আলাইহিস সালামকে পথভ্রষ্ট করেছিলেন’ বাক্যটি ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসে নারী জাতিকে নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। ধারণা করা হয় যে, নারী জাতি উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের আদি রমাতা হাওয়া-এর অপরাধের প্রায়শ্চিত্য ভোগ করে থাকে। অতএব,

নারীদের ওপর নির্ভর করা যাবে না এবং তারা সচ্চরিত্রবান নয়। এছাড়াও বিশ্বাস করা হয় যে, নারী জাতির অপবিত্র হওয়া, গর্ভধারণ করা ও সন্তান প্রসব করা এগুলো হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরাধের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে স্থায়ী শাস্তি। নারীদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আমাদেরকে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের দিকে মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

তাহলে প্রথমে বাইবেলের 'পুরাতন নিয়ম' (old testament) এর কথায় আসা যাক। আমরা এর কারণ খুজতে গিয়ে দেখতে পাই যে, "মহিলারা মৃত্যুর চেয়েও বেশি তিক্ত। সে হচ্ছে ফাদের মতো, তার অন্তর ফিতার মতো এবং হাতগুলো বন্ধন। নেককার ব্যক্তি তাদের থেকে মুক্ত থাকবে। পক্ষান্তরে বদকারদেরকে এদের কারণে পাকড়াও করা হবে।"

দেখুন! আমি এটাই পেয়েছি।

“এক এক করে আমার মনের প্রশ্নের সমাধান খুজে দেখেছি। কিন্তু আমি তার জবাব খুজে পাইন নি। হাজার পুরুষের মধ্যে একজনকে এ রকম পেয়েছি। কিন্তু, হাজারে একজন মহিলাকেও এ রকম পাই নি”।

ক্যাথলিক বাইবেলে আছে ‘এমন কোনো পাপ নেই যাকে নারীর পাপের সাথে তুলনা করা যায়। প্রত্যেক পাপের পিছনে আছে কোনো না কোনো মহিলা আর মহিলাদের কারণেই আমরা সবাই মরে যাব।’ (এক্লিলেসিয়াস্টিকাস: ২৫/১৯,২৪)

এক ইয়াহূদী আলিম প্রচার করেছন, জান্নাত থেকে বের হওয়ার কারণে মহিলাদেরকে ৯ টি অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের ওপর মৃত্যুর আগে ৯টি অভিশাপ রয়েছে। সেগুলো হলো:

- অপবিত্র হওয়া
- কুমারিত্বের রক্ত

. গর্ভধারণের কষ্ট

. সন্তান প্রতিপালন ও সন্তান প্রসবের কষ্ট

. মাথা ঢেকে রাখার বিধান, যেন সে শোক পালন করছে

. তাদের কান ছিদ্র করতে হয়

. তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

এগুলোর পরে রয়েছে মৃত্যু।[2]

এখনও আর্থজেক্স ইয়াহূদী পুরুষগণ তাদের প্রার্থনায় বলে থাকে- আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করি এ জন্য যে, আল্লাহ আমাদেরকে নারী করে দুনিয়ায় পাঠান নি। আর নারীরা বলে: আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা

---

[2] Leonard j.swidlar, women in Judaism: the status of women in formative Judaism (Metuchen, N.J: Scarecrow press, 1976) p.115

করি এ জন্যে যে, তিনি যেমন খুশি তেমনি করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।[3]

ইয়াহূদীদের গ্রন্থে আরেকটি প্রার্থনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মুর্তিপুজারী করে সৃষ্টি করেন নি। প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেন নি, আর প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মূর্খ করে সৃষ্টি করেন নি।[4]

নারীদের প্রতি এ নেতিবাচক ধারণার কুপ্রভাব ইয়াহূদী ধর্মের চেয়ে খৃষ্টান ধর্মে বেশি প্রকট আকার ধারণ করেছে। হাওয়া আলাইহাস সালামের অপরাধের ব্যাপারটা খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসে বড় ধরণের প্রভাব ফেলছে। ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বিধানের সাথে হাওয়া আলাইহিস সালামের নাফরমানীর ফলাফল। তিনি প্রথম

---

[3] Thena kendath, "memories of an orthodox youth" in Susannah heschel, ed. On being a jewish feminist (New york: schocken books, 1983), pp.96-97

[4] Swidler, op. cit., pp. 80-81.

নাফরমানী করেছেন এবং আদম আলাইহিস সালামকে ও তা করার প্ররোচনা দিয়েছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিয়েছেন এবং সে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তাদের এ অপরাধ ক্ষমা করেন নি; বরং তা সমস্ত মানুষের কাছে স্থানান্তরিত হয় প্রত্যেকেই এ গুনাহের বোঝা নিয়ে দুনিয়ায় আসে। এ সমস্ত মানুষের উক্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্য হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। (খৃষ্টানদের ধারণা অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালাম মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। -অনুবাদক) তাকে স্রষ্টার পুত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত কারণে হাওয়া আলাইহাস সালাম তার নিজের, স্বামীর ও সমস্ত মানুষের প্রথম পাপের জন্য দায়ী এমনকি ঈসা আলাইহিস সালামের ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্যেও দায়ী। অন্য কথায়

বলতে গেলে সমস্ত মানুষের জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নেমে আসার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র একজন নারী।[5]

এটা গেল প্রথম মানবী হাওয়া আলাইহাস সালামের কথা। কিন্তু তার কন্যাগণের অবস্থা কী? তারাও তার সমান অপরাধী। তাদের সাথে অপরাধীদের সাথে যেমন আচরণ করতে হয় তেমনি আচরণ করতে হবে।

নতুন নিয়মে (new testament) পল বলেছেন: "মহিলারা চুপিসারে ও নতশীরে শিক্ষা গ্রহণ করবে। আমি কোনো মহিলাকে অনুমতি দেব না কোনো পুরুষকে শিক্ষাদানের বা পুরুষের ওপর কর্তৃত্ব করার, বরং তারা চুপ করে থাকবে (বিনা প্রশ্নে সবকিছু মেনে নেবে)। কারণ, আদম প্রথমে সৃষ্টি হয়েছেন তারপর হাওয়া। আদম নিজে পথভ্রষ্ট হন নি, বরং হাওয়া তাকে পথভ্রষ্ঠ করে দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন"। (১ তিমুথি: ২/১১-১৪)

---

[5] Rosemary R. Ruether, "Christianity", in Arvind Sharma, ed. Women in World Religions (Albany: State University of New York Press, 1987) p. 209.

খৃষ্টান আলিম তারতোলিয়ান উক্ত পোপের চেয়ে আরও বেশি কঠোর ছিলেন। তিনি তার খৃষ্টান মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলতেন: "তোমরা কি জান যে, তোমরা সবাই একেকজন হাওয়া? তোমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আজও বিদ্যমান আছে। পাপ কাজগুলোও আজ বিদ্যমান। তোমরা হচ্ছ ঐ সমস্ত দরজা যা দ্বারা শয়তান প্রবেশ করে। নিষিদ্ধ গাছের পাপাচারের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরাই সর্ব প্রথম পাপ কাজ করেছিলে। যে আদমকে শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে নি, তাকে তোমরাই পথভ্রষ্ট করেছ। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের সম্পর্ককে গুড়িয়ে দিয়েছ। আর তোমাদেরই পাপের কারণেই ইশ্বরের পূত্র ঈসা (খৃষ্টানদের মতে) শুলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন।"

আরেক খৃষ্টান পণ্ডিত আগাস্টাইন ছিলেন তার পুর্বসুরীদের মতোই। তিনি তার বন্ধুকে লিখেছিলেন যে, স্ত্রী আর মায়েদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা উভয় অবস্থায়ই হাওয়া এর অনুরুপ যিনি আদমকে পথভ্রষ্ঠ করেছিলেন। সুতরাং আমাদের সকলের উচিৎ তাদের

থেকে সতর্ক থাকা। আমাদের বুঝে আসে না নারীদেরকে কেন যে সৃষ্টি করা হয়েছে? সন্তান জন্মদান ছাড়া তাদের দ্বারা আর কোনো ফায়দা হয় না।

তার কয়েকশতক পর পণ্ডিত টমাস আকবীনাস বিশ্বাস করত যে, মহিলাদের দিয়ে কোনো লাভ হয় না। তার বক্তব্য হচ্ছে: নারীরা কোনো উপকারে আসে না। পক্ষান্তরে পুরুষেরা নেককার হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের পুত্র সন্তানগণও নেককার হয়; কিন্তু নারীরা জন্মলগ্ন থেকে তাদের পুর্বেকার নারী হাওয়া এর অপরাধের কারণে কলঙ্ক নিয়ে দুনিয়ায় আসে।

সর্বশেষে প্রখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিত মার্টিন লুথার তিনিও সন্তান জন্ম দান ছাড়া নারীদের দিয়ে আর কোনো উপকার হয় বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, যখন তারা ক্লান্ত হয়ে যায় বা মারা যায়, সেটা কোনো ব্যাপারই

নয়। সন্তান জন্মের পর তারা তাদেরকে আদর যত্ন করবে এটাই তাদের দায়িত্ব।[6]

হাওয়া আদম আলাইহিস সালামকে পথভ্রষ্ঠ করেছেন এ বিশ্বাসের কারণে নারীরা খৃষ্টান ধর্মে তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছে। যেমনটি সাফারুত তাকবীনে বর্ণিত হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসে হাওয়া আলাইহিস সালাম ও তার কন্যা সন্তানগণকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হয়।

এবার আসি আল-কুরআন মাজীদে নারীদের সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে তা জেনে নিই। অচিরেই আমরা দেখতে

---

[6] For all the sayings of the prominent Saints, see Karen Armstrong, The Gospel According to Woman (London: Elm Tree Books, 1986) pp. 52-62. See also Nancy van Vuuren, The Subversion of Women as Practiced by Churches, Witch-Hunters, and Other Sexists (Philadelphia: Westminister Press) pp. 28-30.

পাব যে, আল-কুরআন ও ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ধর্মে বর্ণিত নারীদের চিত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

কুরআন নিজেই বলছে:

﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ٣٥﴾ [الاحزاب: ٣٥]

“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর অধিক যিকিরকারী

নারীদের জন্য আল্লাহ তা‘আলা প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৫]

আল-কুরআনের বাণী:

﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

“আর ঈমানদার নারী ও ঈমানদার পুরুষ একে অপরের সহায়ক ও বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেয়। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে,যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে। অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা এদের ওপর দয়া পরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআ‘লা পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।” [সূরা আত-তওবাহ, আয়াত: ৭১]

আল-কুরআনের বাণী:

﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٥﴾ [ال عمران: ١٩٥]

“অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দো‘আ এই বলে কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করি না। চাই সে পুরুষ বা নারী, যেই হোক না কেন। তোমরা পরস্পর এক। অতঃপর যারা হিজরত করেছে তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যু বরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারণ করব আর তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে যার নিচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান। এই হলো আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বিনিময়। আর আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। [সূরা আলে

ইমরান, আয়াত: ১৯৫]

﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ وَمَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٤٠﴾ [غافر: ٤٠]

"যে মন্দ কাজ করে সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিযিক দেওয়া হবে"। [সূরা গাফির, আয়াত: ৪০]

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

"যে সৎকর্ম করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭]

আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআনে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোনো বৈষম্য রাখা হয় নি। আল্লাহ তাদের উভয়কে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তার ইবাদত করে, সৎ কাজ করে এবং খারাপ থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের কাজের জন্য হিসাব নেবেন। আল-কুরআনে কোথাও বলা হয় নি যে,নারীরা শয়তানের প্রবেশদ্বার বা তারা জন্ম নিয়েছে প্রতারণার জন্য। এমনও বলা হয় নি যে, পুরুষেরা স্রষ্টার প্রতিকৃতি বরং পুরুষ নারী উভয়ই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। আল-কুরআনের আয়াতসমূহ পরিস্কার করে বলেছে যে, নারীদের দায়িত্ব শুধুমাত্র সন্তান জন্মদান নয় বরং পুরুষের মতোই সমানে সমান তারও দায়িত্ব রয়েছে নেক আমল করার। আল-কুরআন বলে নি যে, নেককারিনী নারী পাওয়া দুষ্কর, বরং তার বিপরীতে নারী ও পুরুষদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নেককারিনী নারী মারইয়াম আলাইহাস সালাম ও ফিরআউনের স্ত্রী প্রমুখদের অনুসরণ করতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرۡعَوۡنَ إِذۡ قَالَتۡ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرۡعَوۡنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١١ وَمَرۡيَمَ ٱبۡنَتَ عِمۡرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ ١٢﴾ [التحريم: ١١، ١٢]

“আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল: হে আমার রব! আপনার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন। আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরানের কন্যা মারইয়াম আলাইহিস সালামের। যিনি তার সতীত্ব বজায় রেখেছিলেন। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তিনি তার রবের বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন’। [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ১১-১২]

কন্যা সন্তান কি অপমান ডেকে আনে?

আসলে কুরআন ও তাওরাতের মধ্যকার নারী জাতি সংক্রান্ত আলোচনায় মতানৈক্য রয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকেই।

উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, বাইবেলে রয়েছে নারীরা কন্যা সন্তান জন্ম দিলে সন্তান প্রসবের পরে অপবিত্র থাকে ২ সপ্তাহ। পক্ষান্তরে পুত্র সন্তান জন্ম দিলে অপবিত্র থাকে ৭ দিন বা এক সপ্তাহ। (লেভিটিকাস: ১২/২-৫)

আর ক্যাথলিক বাইবেলে পরিস্কারভাবে বলা আছে যে, "কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া একটা ক্ষতি বা লোকসান"। (এক্সিলেসিয়াস্টিকাস: ২২/৩) অপরদিকে ঐ সমস্ত পুরুষদেরকে প্রশংসা করেছে "যে তার পুত্র সন্তানকে শিক্ষাদান করে এবং শত্রুরা তাতে ঈর্ষান্বিত হয়"। (এক্সিলেসিয়াস্টিকাস: ৩০/৩)

দেখুন! ইয়াহূদী পন্ডিতের কার্যকলাপ। ইয়াহূদী পণ্ডিত ইয়াহূদীদেরকে তাগিদ দিচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, সাথে সাথে ছেলে সন্তানদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছে "তোমাদের জন্য

পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া হবে কল্যাণকর আর কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া হবে অকল্যাণকর। সবাই পুত্র সন্তানের জন্মে খুশি হয় কিন্তু, কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তারা চিন্তিত হয়”। “যখন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন তা দুনিয়ায় শান্তি আসার কারণ হয়; পক্ষান্তরে কন্যা সন্তানের জন্মে কিছুই হয় না”।[7]

কন্যা সন্তান তার পিতামাতার জন্য বোঝা এবং অপমানের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। “যদি তোমার কন্যা অবাধ্য হয় তাহলে সতর্ক থেক সে তোমার শত্রুদেরকে হাসাবে এবং সে এলাকাবাসীর গল্পের উপভোগ্য হয়ে তোমার জন্য অপমান ডেকে আনবে”। (এক্লিলেসিয়াস্টিকাস: ৪২/১১)

অবাধ্য নারীর প্রতি তোমার কঠোর হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় তোমার নির্দেশ অমান্য করবে এবং ভুলের ভিতর দিনাতিপাত করবে। যখন সে তোমার অপমানের

---

[7] Swidler, op. cit., p. 140.

কারণ হয়, তখন তুমি আশ্চর্য না হয়ে বরং বিচক্ষণতার পরিচয় দাও। (এক্লিলেসিয়াস্টিকাস: ২৬/১০-১১)

আর এমনটিই করেছিল জাহেলী যুগের কাফিররা। তারা কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। কুরআন তাদের এ কু-কর্মকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছে। আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ۝٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ۝٥٩﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

“আর যখন তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনোযন্ত্রনায় ভুগতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখমণ্ডল গোপন করে থাকে। সে ভাবে, সে কি অপমান সহ্য করে তাকে দুনিয়ায় থাকতে দেবে নাকি তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ! তাদের কৃত ফয়সালা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯]

যদি আর-কুরআনে এটাকে নিষিদ্ধ না করা হত, তাহলে এ নিকৃষ্ট কাজটি আজও দুনিয়ায় অব্যাহত থাকত। কুরআন শুধুমাত্র এ কাজটিকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং কুরআন পুরুষ ও নারীর ভিতরে কোনো পার্থক্যেরও সৃষ্টি করে নি। এটা বাইবেলের বিপরীত। আর-কুরআন কন্যা সন্তানের জন্মকে পুত্র সন্তানের মতোই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও বিশেষ দান হিসেবে গণ্য করেছে।

প্রথমতঃ কন্যা সন্তানের জন্মকে আর-কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বা অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩﴾ [الشورا: ٤٩]

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯]

বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রচলনকে চিরতরে উৎখাত করার জন্য কন্যা সন্তানের লালন-পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীকে সুমহান পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

“যাকে কোনো কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং সে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হয়ে থাকবে”। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

“যে দুইজন কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করেছে সে আর আমি কিয়ামতের দিন এভাবে

আসব। অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলিসমূহকে একত্রিত করলেন।” (সহীহ মুসলিম)

নারী শিক্ষা

তাওরাত ও কুরআনে বর্ণিত নারীদের চিত্রের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে তা শুধুমাত্র নবজাতক কন্যা সন্তানের বেলায়ই সীমাবদ্ধ নয় বরং এ পার্থক্য জন্মের পরেও চলমান থাকে। এখন আমরা নারী শিক্ষা নিয়ে কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তুলনামুলক আলোচনা করব।

ইয়াহূদীদের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে তাওরাত। তাওরাতে এসেছে- নারীদের তাওরাত পড়ার কোনো অধিকার নেই। জনৈক ইয়াহূদী পণ্ডিত এ কথাটাকে আরও স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন: “মহিলারা তাওরাত পড়ার চেয়ে তাওরাতকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা উত্তম।” এ ছাড়াও

এসেছে “কোনো পুরুষের অধিকার নেই তার কন্যা সন্তানকে তাওরাত শিক্ষাদানের”।[8]

পোল নতুন নিয়মে (new testament) বলেছেন: “তোমাদের স্ত্রীরা গীর্জার ভিতরে চুপ করে থাকবে। কেননা গীর্জার ভিতর কথাবার্তা বলার কোনো অধিকার তাদের নেই। এমনকি আইন যা বলবে তাকে বিনা প্রশ্নে নতশীরে মেনে নিবে। তবে যদি তারা কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাহলে, তা শিখবে বাড়ীতে নিজ নিজ স্বামীর কাছ থেকে। কারণ, গীর্জার মধ্যে নারীদের কথা বলা অত্যন্ত জঘন্য কাজ”। (১ করিনথিয়ান্স: ১৪/৩৪-৩৫)

নারীদের যদি কথা বলার কোনো অনুমতি না থাকে, তাহলে তারা কীভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে? যদি কোনো কিছু বাধ্যতামুলকভাবে মেনে নিতে হয় তাহলে, তাদের চিন্তার বিকাশ ঘটবে কীভাবে? যদি একমাত্র স্বামীই হয় তার শিক্ষা গ্রহণের অবলম্বন তাহলে কীভাবে তারা বেশি

[8] Denise L. Carmody, "Judaism", in Arvind Sharma, ed., op. cit., p. 197.

বেশি জ্ঞানার্জন করবে? ন্যায় বিচার করতে গেলে অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করতে হবে যে, ইসলাম কি তার চেয়ে বিপরীত?

আল-কুরআনে খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহু সংক্রান্ত একটা ঘটনা এসেছে সেখানে উক্ত বিষয় গুলোকে অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তার স্বামী আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগের বশঃবর্তী হয়ে বলেছিলেন: "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতো হারাম।" এ কথাটা ইসলাম পূর্ব যুগে আরব সমাজে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ হিসেবে ব্যবহৃত হত; কিন্তু স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বসা বা স্বামীর বাড়ী ত্যাগ করার অনুমতি ছিল না। খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বামীর মুখে এ ধরণের কথা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। সরাসরি চলে গেলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘটনা বর্ণনা করতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো সমাধান না থাকায় ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এটা

নিয়ে বাদানুবাদ করতে থাকলেন নিজেদের বিবাহ বন্ধন অক্ষুন্ন রাখার মানসে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করে তার সমস্যার সমাধান দিয়ে এ ধরণের প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এ সময় সূরা মুজাদালাহ নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ١﴾ [المجادلة: ١]

“যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে। আল্লাহ তা‘আলা তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১]

কুরআন নারীকে অধিকার দেয় স্বয়ং আল্লাহর নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে বাদানুবাদ করার। তাদেরকে চুপ করিয়ে রাখার অধিকার কারো নেই।

নারীকে এতেও বাধ্য করা হয় নি যে, তার একমাত্র শিক্ষাগ্রহণস্থল হবে তার স্বামী।

ঋতুবতী নারী আশ পাশের সব কিছুকে নাপাক করে দেয়?

বিশেষভাবে ইয়াহূদী বিধি-বিধান ঋতুবতী মহিলাদেরকে কঠোরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। পুরাতন নিয়ম (old testament) ঋতুবতী মহিলাদেরকে এবং তাদের আশে পাশের সব কিছুকে নাপাক হিসেবে গণ্য করেছে। যে কোনো জিনিস সে স্পর্শ করলেই পুরো দিনব্যাপী তা নাপাক থাকবে। যদি কোনো মহিলার শরীরে কোনো প্রবাহিত রক্ত থাকে যা গোশতের উপর প্রবাহিত হয়, তাহলে সে এক সপ্তাহ পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। যে তাকে স্পর্শ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। সে যার উপর বসবে বা শয়ন করবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। যে তার বিছানা স্পর্শ করবে তার শরীরের পোশাক ধৌত করতে হবে, গোসল করতে হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নাপাক থাকবে। সে যার উপর বসেছে এমন কোনো

আসবাব পত্রকে স্পর্শ করলেও অনুরুপ তাকে গোসল ও তার পোশাক ধৌত করতে হবে। এমতাবস্থায় সে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাপাক থাকবে। (লেভিটিকাস: ১৫/১৯-২৩)

এ কারণে মাঝে মাঝে নারীদেরকে কারো সাথে কোনো ধরণের আচার-আচরণ বা উঠাবসা করতে নিষেধ করা হত। তাদেরকে ঋতুবতী হলে উক্ত সময়টা কাটাতে 'নাপাক ভবন' এ পাঠিয়ে দেওয়া হত।[9]

ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্র ঋতুবতী মহিলাকে সে কাউকে স্পর্শ না করা সত্বেও হত্যাকারীনী হিসেবে গণ্য করে।

ইয়াহূদী পণ্ডিতের মতে, যদি কোনো ঋতুবতী মহিলা ঋতুর শুরুতে দুইজন পুরুষের মাঝ দিয়ে হেটে যায় তাহলে, তাদের একজন মারা যাবে। আর যদি ঋতুর শেষের দিকে হয় তাহলে,তাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হবে।[10]

---

[9] Swidler, op. cit., p. 137.

[10] bpes.111a

ঋতুবতী মহিলার স্বামীকেও ইয়াহূদীদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করায় বাধা দেওয়া হত। কেননা তার স্ত্রী যে মাটির উপর চলাফেরা করেছে একই মাটির উপর চলাফেরা করার কারণে সেও নাপাক। যে ইয়াহূদী পণ্ডিতের স্ত্রী,কন্যা বা মাতা ঋতুবতী থাকে তাকে তাদের উপাসনালয়ে খুতবাহ দিতে দেওয়া হত না।[11]

এ জন্য এখনও কিছু কিছু ইয়াহূদী মহিলা ঋতুকে "অভিশাপ" নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন।[12]

কিন্তু ইসলাম কোনো ঋতুবতী মহিলাকে বলে না যে, সে তার আশেপাশের জিনিসকে নাপাক করে দেয়। তার ওপর অভিশাপ দেয় না। সালাত ও সাওমের মতো কয়েকটি ইবাদাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যতীত সে সম্পূর্ণ সাধারণ জীবন যাপন করে।

সাক্ষ্যদানের অধিকার

---

[11] Ibid., p. 138.

[12] Sally Priesand, Judaism and the New Woman (New York : Behrman House, Inc., 1975) p. 24.

আরেকটি বিষয় নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার। কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এটা নিয়ে বেশ মতবিরোধ রয়েছে। আর-কুরআন মুমিনদেরকে কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের সময় দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী রাখার বিধান রেখেছে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰۚ ٢٨٢﴾ [البقرة: ٢٨٢]

“তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্যে দুইজনকে সাক্ষী রাখ। যদি দুই জন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন নারীকে সাক্ষী রাখ যাদের সাক্ষ্য তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য থেকে; একজন যদি ভুলে যায়, তাহলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮২]

কুরআনের অন্য স্থানে নারীর সাক্ষ্যকে পুরুষের সমান বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের

সাক্ষ্যকে বাতিল করে দেয়। যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় আর-কুরআন তাকে নির্দেশ দেয় তার অভিযোগের স্বপক্ষে পাঁচবার কসম করতে। অনুরুপ স্ত্রী যদি তা অস্বীকার করে এবং নিজের মতের স্বপক্ষে পাচবার কসম করে তাহলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। উপরোক্ত উভয় অবস্থায় তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡۚ لَا تَحۡسَبُوهُ شَرّٗا لَّكُمۖ بَلۡ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُم مَّا ٱكۡتَسَبَ مِنَ ٱلۡإِثۡمِۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبۡرَهُۥ مِنۡهُمۡ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١١﴾ [النور: ٦، ١١]

“এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী না থাকে, এরুপ ব্যক্তির সাক্ষ্য হবে- সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে,সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে,তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার (নিজের) ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে,তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তার

জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬-১]

আগে ইয়াহূদী সমাজে নারীদেরকে সাক্ষ্যদানের অধিকার দেওয়া হত না।[13]

ইয়াহূদী পণ্ডিতের মতে- জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর নারীদের প্রতি যে সমস্ত অভিশাপ এসেছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া। বর্তমানেও ইসরাঈলে ইয়াহূদীদের ধর্মীয় কোর্টে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না।[14]

এর কারণ হিসেবে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের ভাষ্য হচ্ছে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাহ মিথ্যা বলেছিলেন। (জেনেসিস: ১৬/৯-১৮) অথচ এ ঘটনাটি আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও

---

[13] Swidler, op. cit., p. 115

[14] Lesley Hazleton, Israeli Women The Reality Behind the Myths (New York: Simon and Schuster, 1977) p. 41.

কোথাও বলা হয় নি যে, সারাহ মিথ্যা বলেছিলেন।" [সূরা হূদ, আয়াত: ৬৯-৭৪, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ২৪-৩০ দ্রষ্টব্য]

ধর্মীয় বা আধুনিক আইন বিশারদ পশ্চিমা খৃষ্টানগণের কেউ গত শতাব্দীর আগ পর্যন্ত কখনো নারীকে সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয় নি।[15]

কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দিলে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। বাইবেলের নির্দেশনানুযায়ী অভিযুক্ত মহিলা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে অপমানজনকভাবে কোর্টে হাযির হবে। (নং ৫/১১-৩১) কোর্টে যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয় তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর যদি মহিলা নির্দোষ প্রমাণিত হয় তথাপিও অপবাদের কারণে স্বামীর কোনো শাস্তি হবে না। যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে বিবাহ করে দাবী করে যে, সে কুমারী নয়; এ ক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় বরং মহিলার পরিবারের ওপর দায়িত্ব এসে যাবে

---

[15] Gage, op. cit. p. 142.

শহরের বয়স্ক লোকদের সামনে তাকে কুমারী হিসেবে প্রমাণ করা। যদি তারা তাকে কুমারী প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে মহিলাকে পিত্রালয়ের সামনে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। আর যদি তারা তাকে কুমারী প্রমাণ করতে পারে, তাহলে তার স্বামীর ওপর ১০০ রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা করা হবে এবং আজীবনের জন্য তাকে তালাক দেওয়ার অধিকার খর্ব করা হবে।

বলা হয়েছে "যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকটবর্তী হয়ে তাকে অপছন্দ করে এবং সমাজে তার দুর্নাম করে বলে: আমি একে বিবাহ করে কুমারী হিসেবে পাই নি। তখন তার পিতামাতা তাকে নিয়ে যাবে এবং তাদের বাড়ীর সামনে অবস্থানরত সমাজের বয়স্কদের সামনে তার কুমারিত্বের প্রমাণ হাযির করে বলবে: আমি আমার কন্যাকে এই লোকের সাথে বিবাহ দিয়েছি। সে তাকে অপছন্দ করে কুমারী পায় নি বলে সমাজে দূর্নাম ছড়াচ্ছে। এই দেখুন! এটা তার কুমারিত্বের প্রমাণ বলে বয়স্কদেরকে তার কাপড় দেখাবে। তখন সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা ঐ ছেলেকে ধরে

নিয়ে শাসন করবে এবং ১০০ রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা করে অপবাদের বিনিময় হিসেবে মেয়ের পিতাকে দেবে। আর ঐ মেয়ে হবে তার আজীবনের জন্য স্ত্রী। তালাক দেওয়ার কোনো অধিকার তার অবশিষ্ট্য থাকবে না; পক্ষান্তরে যদি কন্যার কুমারিত্ব না পাওয়া যায় তাহলে মেয়েকে পিত্রালয়ের সামনে নিয়ে এসে পুরুষেরা তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। কেননা সে ব্যভিচার করে তার পিত্রালয়কে কলংকৃত করেছে। তাই এ পাপিষ্টকে ওদের থেকে দূর করে ফেলতে হবে। (ডিউটারনমী: ২২/১৩-২১)

ব্যভিচার

প্রত্যেক ধর্মে ব্যভিচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাইবেল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী উভয়কে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, “যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, আর ব্যভিচারীনী তার নিকটাত্মীয় হয় তাহলে তাদের উভয়কেই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে”। (লেভিটিকাস: ২০/১০)

ইসলামও ব্যভিচারীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢﴾ [النور: ٢]

"ব্যভিচারিনী নারী, ব্যভিচারী পুরুষ -তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে গিয়ে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তার রাসুলের প্রতি প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর মুসলিমদের মধ্যকার একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২]

তবে ব্যভিচারের সজ্ঞায় কুরআন ও বাইবেলে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে- ব্যভিচার হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যকার অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক। পক্ষান্তরে, বাইবেলে ব্যভিচারকে শুধুমাত্র বিবাহিতদের মাঝে আবদ্ধ করা হয়েছে। যখন বিবাহিত পুরুষ ও

বিবাহিতা নারীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক পাওয়া যাবে তখনই তাদেরকে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী হিসেবে গণ্য করা হবে। যখন কোনো বিবাহিত পুরুষকে অপরের স্ত্রীর সাথে পাওয়া যাবে তখন তাদের উভয়কেই হত্যা করা হবে। এবং বনী ইসরাইল থেকে এসব আপদ দূর করতে হবে। (ডিউটারনমী: ২২/২২) "আর কোনো পুরুষ যদি তার নিকটাত্মীয় মহিলার সাথে ব্যভিচার করে তাদের উভয়কেই হত্যা করা হবে"। (লেভিটিকাস: ২০/১০)

বাইবেলের নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো বিবাহিত পুরুষ কোনো অবিবাহিত মহিলার সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তা ব্যভিচার বলে ধর্তব্য হবে না। এমতাবস্থায় উক্ত পুরুষ ও নারী ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী হিসেবে গণ্য হবে না, বরং ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে যখন কোনো পুরুষ বিবাহিত হোক বা না হোক নারী বিবাহিতা হয়।

সংক্ষেপে ব্যভিচার হলো বিবাহিতা নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক। বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচারী হিসেবে পরিগণিত হবে না।

এখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে দু'রকম বিধান কেন? ইয়াহূদী বিশ্বকোষের মতে নারীরা পুরুষের মালিকানাধীর পণ্যের মত। পুরুষের অধিকার নষ্ট করলে তা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে; পক্ষান্তরে নারীরা পুরুষের মালিকানাধীন পণ্য হওয়ার কারণে তার এ ধরণের কোনো অধিকার নেই।[16]

কোনো পুরুষ অপরের স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে তা আরেক জনের (মহিলার স্বামীর) অধিকারে হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। তাই তাকে এ জন্য শাস্তি পেতে হবে। বর্তমানে ইসরাঈলে যদি কোনো পুরুষ

---

[16] Jeffrey H. Togay, "Adultery," Encyclopaedia Judaica, Vol. II, col. 313. Also, see Judith Plaskow, Standing Again at Sinai : Judaism from a Feminist Perspective (New York: Harper & Row Publishers, 1990) pp. 170-177.

অবিবাহিতা মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে সন্তান হয় তারা বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হয়। আর যদি বিবাহিতা মহিলার সাথে কোনো পুরুষ (বিবাহিত হোক বা না হোক) অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে সন্তান হয়, তাদের সন্তানরা শুধু অবৈধই নয় বরং তারা সমাজ থেকে বিতাড়িত হয় এবং তাদেরকে অনুরূপ বিতাড়িত বা ধর্ম ত্যাগকারী ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ করতে পারে না। এ শাস্তি পরবর্তী দশটি প্রজন্ম পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যাতে তাদের অপমান কিছুটা হলেও কমে যায়।[17]

কিন্তু ইসলাম নারীকে এরূপ মনে করে না বরং আল-কুরআন বলে:

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

[17] Hazleton, op. cit., pp. 41-42.

“আর আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

এটা হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত বিবাহের চিত্র, যা হবে ভালোবাসা, দয়া,সম্প্রীতি ও শান্তির ঠিকানা। এখানে কেউ কারো পণ্য বা দাসী নয়। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এখানে নেই কোনো দ্বিমুখী বিধান।

মান্নত করা

বাইবেল অনুযায়ী আল্লাহর পথে যে কোনো মান্নত পুরণ করা আবশ্যক। মান্নত করার পর তা আদায় করতে টালবাহানা করা বাঞ্চনীয় নয়। কিন্তু নারীদের নিজ ইচ্ছায় মান্নত করা বৈধ নয়; বরং অবিবাহিতা হলে পিতা আর বিবাহিতা হলে স্বামীর অনুমোদন লাগবে। তারা যদি

অনুমোদন না দেয়, তাহলে তারা মান্নতই করে নাই বলে গণ্য হবে। বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী “কোনো পুরুষ যদি আল্লাহর নামে মান্নত করে বা কসম করে তাহলে তার মুখের কথা অনুযায়ী তা পূর্ণ করা আবশ্যক। কিন্তু মহিলারা যদি আল্লাহর নামে মান্নত করে এবং তার পিতা (পিত্রালয়ে থাকার সময়) তা শুনে চুপ করে থাকে তাহলে,সে মান্নত পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। মান্নতের কথা শ্রবণের দিন পিতা যদি নিষেধ করে তাহলে, তার মান্নতসমূহ পুরণ করার কোনো অধিকার থাকবে না; বরং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। যদি সে তার স্বামীর জন্য বা অন্য কোনো কারণে মান্নত করে থাকে, স্বামী তা শুনে চুপ থাকলেই তা অনুমোদিত হবে; অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যাত হবে”। (নং ৩০/২-১৫)

কেন মান্নত করার সময় নারীর কথা গৃহীত হবে না? উত্তর খুবই সংক্ষেপ: সে বিবাহের পূর্বে পিতার মালিকানাধীন আর বিবাহের পরে স্বামীর। এ মালিকানা পিতাকে নিজ কন্যাকে বিক্রি করার অধিকার পর্যন্ত দিয়ে দেয়। পিতা চাইলে কন্যাকে বিক্রি করতে পারে এ

অধিকার তার আছে। আর ইয়াহূদী পণ্ডিতরা বলে থাকে, পিতা তার কন্যাকে বিক্রি করতে পারে, কিন্তু মা তার কন্যাকে বিক্রি করতে পারবে না। পিতা তার কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য কাউকে প্রস্তাব দিতে পারে, কিন্তু মা সেটা পারে না"।[18]

ইয়াহূদী পণ্ডিতরা আরও পরিস্কার করে বলেছেন যে, কোনো মহিলা বিবাহ করার পর তার স্বামীর পূর্ণ মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। তাদের মতে "বিবাহ মহিলাকে তার স্বামীর মালিকানাধীন বানিয়ে দেয় যা কখনো নষ্ট হবার নয়"। তাই কোনো মহিলার উচিৎ নয় তার মালিকের বিনা অনুমতিতে কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা করা।

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসের এ অবস্থান নারীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত। পশ্চিমা বিশ্বে বিবাহিতা মহিলারা যাই করতে চেয়েছে তার কোনো বৈধতা ছিল না। তাদের স্বামীদের

[18] Swidler, op. cit., p. 141.

অধিকার ছিল স্ত্রী যে কোনো চুক্তি করলে তারা তা বাতিল করতে পারবে। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সমাজে স্ত্রী কোনো কিছু করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়। কেননা তারা অন্যের মালিকানাধিন পণ্যের মত। পশ্চিমা মহিলারা প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত পিতা ও স্বামীর অধিকারে থাকার কারণে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণায় ভূগেছে।[19]

ইসলামে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার অধিকার আছে স্বেচ্ছায় মান্নত করার। তার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করার নৈতিক অধিকার কারো নেই। পুরুষ বা নারী যদি কোনো কারণে ওয়াদা পুরণে ব্যর্থ হয় তাহলে, তার জন্য কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্য প্রদান করা আবশ্যক।

আল-কুরআনে এসেছে:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا

---

[19] Matilda J. Gage, Woman, Church, and State (New York : Truth Seeker Company, 1893) p. 141.

تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٨٩﴾ [المائدة: ٨٩]

"আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; বরং পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা মজবুত করে রাখ। অতএব, এর কাফফারা হচ্ছে: দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করবে মধ্যম শ্রেণির খাদ্য যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে দিয়ে থাক অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে কিংবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করবে। যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না সে তিনদিন সাওম পালন করবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা যখন তোমরা শপথ কর। তোমরা তোমাদের কৃত শপথসমূহকে রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮৯]

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে মুমিন পুরুষ ও নারীরা আনুগত্য ও আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে বায়আত বা অঙ্গীকার করত। নারীরা ও ছিল পুরুষের সমানে সমান। (সূরা মুমতাহিনা, ১২ দেখুন) এমনকি কোনো পুরুষের অধিকার নেই স্ত্রী বা কন্যার পক্ষ থেকে নিজে শপথ করবে বা তারা শপথ করলে তা প্রত্যাখ্যান করবে।

স্ত্রীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব

ইসলাম, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান তিনটি ধর্মই বিবাহ ও পরিবার গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছে। স্বামী পরিবারের অভিভাবক, এতে সবাই একমত। তবে, মতভেদ রয়েছে স্বামীর ক্ষমতার গন্ডিতে। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম পুরোপুরি ইসলামের বিপরীত। তারা স্বামীকে স্ত্রীর ওপর একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার দিয়েছে। ইয়াহূদী ধর্মে স্ত্রী যেন স্বামীর কাছে দাসীর সমতুল্য গণ্য হয়।[20]

---

[20] Louis M. Epstein, The Jewish Marriage Contract (New York : Arno Press, 1973) p. 149.

এ কারণে ব্যভিচারের বিধানে পুরুষ ও নারীর জন্য দু'রকম আইন রয়েছে। স্বামীকে অধিকার দেওয়া হয়েছে স্ত্রীর মান্নতের ওপর প্রভাব খাটানোর। এ বিধান নারীকে সম্পদ ও মালিকানাধীন সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ইয়াহূদী নারী শুধুমাত্র বিবাহের কারণে স্বামীর মালিকানায় চলে আসে এবং স্বামী তার স্ত্রীর সম্পদ ও সম্পত্তিতে প্রভাব খাটায়। ইয়াহূদী পন্ডিতেরা বলে থাকে যে, বিবাহের কারণে স্ত্রী ও তার ধন সম্পদ স্বামীর অধিকারে চলে আসে।[21]

এ ছাড়াও এ বিধানের কারণে বিবাহের পরে ধনী স্ত্রী সম্পদহীনা হয়ে পড়ে। ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্রে (তালমুদে) বলা হয়েছে "নারীর কোনো সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার নেই। তার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদ স্বামীর বলে গণ্য হবে। স্বামীর মালিকানাধীন সম্পদ তো আছেই এমনকি স্ত্রীর সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে আসবে। স্ত্রী যা অর্জন করবে বা রাস্তায় কুড়িয়ে পাবে এবং বাড়ীর সমস্ত

---

[21] Swidler, op. cit., p. 142.

কিছু এমনকি রুটির টুকরাও স্বামীর অধিকারে। মহিলা কোনো লোককে ডেকে মেহমানদারী করলে তা স্বামীর মাল থেকে চুরি হিসেবে গণ্য হবে”। (তালমুদ san 71a, git 62a)

ইয়াহূদী মহিলারা নিজ সম্পদ দিয়ে প্রস্তাবদানকারীকে আকৃষ্ট করে। ইয়াহূদী পরিবারে পিতা তার সম্পদের কিছু অংশ তার মের জন্য রেখে দেয় যা যৌতুক হিসেবে স্বামীকে দিতে হয়। এ যৌতুকের কারণে ইয়াহূদী পিতার নিকট কন্যা সন্তানের জন্মটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কন্যাকে ছোটকাল থেকে মানুষ করার দ্বারা তার দায়িত্ব আদায় হয় না; বরং নিজের সম্পদ থেকে কিছু অংশ তার বিবাহের জন্য রেখে দিতে হয়। ফলে ইয়াহূদী সমাজে কন্যা সন্তান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[22]

প্রাচীন ইয়াহূদী সমাজে কন্যা সন্তান জন্মের সময়ে পরিবারের সদস্যদের খুশি না হওয়ার কারণ এখান

---

[22] Epstein, op. cit., pp. 164-165.

থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। (দেখুন: কন্যা সন্তান কি অপমান ডেকে আনে? অধ্যায়টি)

যৌতুক স্বামীর জন্য উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। স্বামী তার মালিক হলেও তা বিক্রি করার অধিকার তার নেই। এ সম্পদে স্ত্রীরও কোনো অধিকার নেই। বিবাহের পর স্ত্রীর ওপর কাজকর্ম করা বাধ্যতামূলক তবে, যা রোজগার করবে সবই স্বামীর মালিকানায় চলে যাবে। কেননা সে তার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। দু'টি অবস্থা ছাড়া তার মালিকানাধীন সম্পদ সে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার নেই। ১. তালাক দিলে অথবা ২. স্বামীর মৃত্যু।

স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী মারা গেলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। আর স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্বামী মারা গেলে স্ত্রী শুধুমাত্র বিবাহের সময় যৌতুক হিসেবে দেওয়া সম্পদের দাবী করতে পারবে, অন্য কোনো সম্পদ চাওয়ার অধিকার তার থাকবে না। স্বামী তার নতুন স্ত্রীকে

উপহার সামগ্রী দিবে, তবে তাও স্বামীর অধিকারে থাকবে।[23]

খৃষ্টান ধর্মও অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইয়াহূদীদের উক্ত নিয়মাবলী পালন করে আসছিল। কনস্টান্টিনোপল সাম্রাজ্যের পরবর্তী খৃষ্টান রোমান সাম্রাজ্যের নাগরিক ও ধর্মীয় বিধানাবলীতে স্বামীর জন্য বিবাহের সময় মীরাসের (উত্তরাধিকার) শর্তারোপ করা হত। পরিবারকে তাদের কন্যাদের জন্য উঁচুমানের যৌতুক নির্ধারণ করে রাখতে হত। ফলশ্রুতিতে পুরুষেরা তড়িঘড়ি করে বিবাহ করত অথচ পরিবারের মহিলারা দেরীতে বিবাহ করতে বাধ্য হত।[24]

খৃষ্টানদের গীর্জার নিয়মানুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে এবং ব্যভিচারের দোষে অভিযুক্ত না হলে স্ত্রী তার প্রদত্ত

---

[23] Ibid., pp. 112-113. See also Priesand, op. cit., p. 15.

[24] James A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe (Chicago: University of Chicago Press, 1987) p. 88.

যৌতুকের মালামাল দাবী করতে পারে। আর ব্যভিচারের দোষে অভিযুক্ত হলে উক্ত সম্পদের দাবি জরিমানা হিসেবে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে।[25]

নাগরিক ও গীর্জার ধর্মীয় বিধানানুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার নারীদের নিজের অধিকারভূক্ত সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিল না। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুতকৃত নারী অধিকার আইনে বলা হয়েছিল "স্বামীর মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদের মালিক স্বামী নিজেই, আর স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পদের মালিকও তার স্বামী"।[26]

স্ত্রী বিবাহের পর তার অধিকারভূক্ত সম্পদের মালিকানাই শুধু হারায় না বরং তার নিজের ব্যক্তিত্বও হারায়। স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করার অধিকারটুকুও সে পায় না। তার যে

---

[25] Ibid., p. 480.

[26] R. Thompson, Women in Stuart England and America (London: Routledge & Kegan Paul, 1974) p. 162.

কোনো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বা কাজ বাতিল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে স্বামীকে। এছাড়া যার সাথে নারী চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেও অপরাধী এবং অপরাধে সহযোগিতাকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা নিজের নামে বা স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইতে পারে না।[27]

আইনানুযায়ী বিবাহিত নারীদের সাথে শিশুদের মত ব্যবহার করতে হবে। সে স্বামীর মালিকানাধীন পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং নিজের মালিকানাধীন সম্পদ, ব্যক্তিত্ব ও বংশ পরিচয় সবকিছু হারিয়ে ফেলবে।[28]

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম নারীদেরকে নিকট অতীত পর্যন্ত যে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল ইসলাম সে সকল অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছে। মুসলিম নারীদের নিজ স্বামীকে কোনো কিছু যৌতুক হিসেবে দিতে হয় না এবং সে সমাজে দুশ্চিন্তার কারণ হিসেবে

---

[27] Mary Murray, The Law of the Father (London: Routledge, 1995) p. 67.

[28] Gage, op. cit., p. 143.

ধর্তব্য হয় না। ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে তাই তার কোনো প্রয়োজন হয় না নিজের অর্থ সম্পদ দেখিয়ে কোনো যুবককে (বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ায়) প্রলুব্ধ করার, বরং স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য স্ত্রীকে উপহার তথা মোহরানা পরিশোধ করা। এ মোহরানার সম্পদের পরিপূর্ণ মালিকানা স্ত্রীর নিজের; স্বামী, পরিবারের সদস্য বা অন্য কারো তাতে অধিকার নেই। কিছু কিছু মুসলিম সমাজে এ মোহরানার পরিমাণ হয়ে থাকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) ডলারের সমপরিমান পর্যন্ত হয়ে থাকে।[29]

তালাক হয়ে গেলেও তার সে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হয় না। স্ত্রী স্বেচ্ছায় না দিলে তার মালিকানাধীন সম্পত্তিতে স্বামীর বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই।[30]

---

[29] For example, see Jeffrey Lang, Struggling to Surrender, (Beltsville, MD: Amana Publications, 1994) p. 167.

[30] Elsayyed Sabiq, Fiqh al Sunnah (Cairo: Darul Fatah lile'lam Al-Arabi, 11th edition, 1994), vol. 2, pp. 218-229.

আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন,

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤﴾ [النساء: ٤]

“তোমরা খুশি মনে তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কোনো অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪]

স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পদে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। কেননা তার নিজের ও তার সন্তানদের জীবন পরিচালনা করার দায়িত্ব স্বামীর ওপর ন্যস্ত।[31]

স্ত্রী যতই ধনী হোক না কেন পরিবারের কোনো খরচ পরিচালনা করা তার জন্য আবশ্যক নয়, তবে যদি সে করে তা ভিন্ন কথা। স্বামী মারা গেলে সে যেমন, তার

---

[31] Abdel-Haleem Abu Shuqqa, Tahreer al Mar'aa fi Asr al Risala (Kuwait: Dar al Qalam, 1990) pp. 109-112.

উত্তরাধিকারী সম্পদে অংশীদার হবে তেমনি স্ত্রী মারা গেলেও স্বামী তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ইসলামে বিবাহের পরেও স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও বংশগত ঐতিহ্য অবশিষ্ট থাকে।[32]

একবার এক আমেরিকান বিচারক বলেছিলেন "মুসলিম নারীরা সূর্যের মতোই স্বাধীন। **দশবারও যদি তারা বিবাহ করে তবুও তারা তাদের স্বাধীনতা ও বংশ পরিচয় ধরে রাখতে পারে**"।[33]

তালাক

তালাক নিয়ে তিনটি ধর্মে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে। খৃষ্টান ধর্মে তালাককে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা বাইবেলের নতুন নিয়মের (New Testament)

---

[32] Leila Badawi, "Islam", in Jean Holm and John Bowker, ed,. Women in Religion (London: Pinter Publishers, 1994) p. 102.

[33] Amir H. Siddiqi, Studies in Islamic History (Karachi : Jamiyatul Falah Publications, 3rd edition, 1967) p. 138.

বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোধগম্য হয়। ঈসা আলাইহিস সালামের নামে প্রচার করা হয় যে, তিনি বলেছেন: “আমি বলছি যে তার স্ত্রীকে তালাক দেবে সে যেন তার স্ত্রীর জন্য ব্যভিচারের দরজা উন্মুক্ত করে দিল। আর যে তালাকপ্রাপ্তাকে বিবাহ করল সে যেন ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ল”। (ম্যাথিউ: ৫/৩২)

কিন্তু, এগুলো বাস্তবে বাস্তবায়ন করা হয় না। এগুলো ধার্মিকতার দাবি হওয়া সত্বেও কখনও সম্ভব নয়। বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতার কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান তাদের কোনো উপকারে আসবে না। স্বামী স্ত্রীর জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে গেলে তাদেরকে জোর করে একত্র রাখার কোনো অর্থ হয় না। তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, খৃষ্টান সমাজ আজ তালাককে বৈধতা প্রদান করতে বাধ্য হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইয়াহূদীরা কোনো কারণ ছাড়াই তালাককে বৈধতা দিয়েছে। পুরাতন নিয়ম (Old Testament)

পুরুষকে অধিকার দিয়েছে যে,নিছক পছন্দ-অপছন্দের কারণেই সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। বলা হয়েছে: “কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিবাহ করার পর কোনো ত্রুটির কারণে তাকে পছন্দ না হয়। এরপর সে তালাক লিখে স্ত্রীকে দিয়ে দিল। স্ত্রী তার বাড়ী থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার আরেকজনকে বিবাহ করল। সেও স্ত্রী পছন্দসই না হওয়ার কারণে তালাক লিখে স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিল। এমতাবস্থায় প্রথম স্বামীর জন্য এ স্ত্রী পুনরায় বৈধ হবে না। কেননা স্রষ্টার দৃষ্টিতে সে তখন নাপাক। তোমাকে আল্লাহ তা‘আলা যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার অতিরিক্ত গ্রহণ করতে পদক্ষেপন করো না”। (ডিউটারনমী: ২৪/১-৪)

ইয়াহূদী পণ্ডিতরা ‘অপছন্দ ও দোষ’ শব্দ দু’টির ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করেছেন। ইয়াহূদী ধর্ম শাস্ত্র ‘তালমুদে’ তাদের এ সমস্ত মতবিরোধের বর্ণনা এসেছে। ‘শামাঈ’ গোত্রের মতে স্ত্রী পাপাচারে লিপ্ত না হলে তাকে তালাক দেওয়া যাবে না। ‘হালীল’ গোত্রের মতে- যে কোনো কারণে এবং যখন খুশি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে।

এমনকি নিছক খাদ্য নষ্ট করে ফেললেও। ইয়াহূদী পণ্ডিত 'আকীবা' বলেন, স্বামীর অধিকার আছে সে বর্তমান স্ত্রীর চেয়ে বেশি সুন্দরী স্ত্রী পেলেও আগের স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। (গিট্টিন ৯০ A-B)

নতুন নিয়ম (New testament) শামাঈদের মতকে গ্রহণ করেছে। অপর দিকে ইয়াহূদী আইনে 'হালীল ও আকীবার' মতামতকে গ্রহণ করেছে। আর এ মতই বহুল প্রচলিত।[34]

এ আইন স্বামীকে অধিকার দেয় কোনো কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার; পক্ষান্তরে পুরাতন নিয়ম (Old Testament) পুরুষকে অপছন্দ হলে তালাক দেওয়ার শুধু বৈধতাই দেয় না; বরং তাকে নির্দেশও দেয়। বলা হয়েছে "খারাপ স্ত্রী তার স্বামীর জন্য অপমান বয়ে আনে এবং সে অপরের ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র হয়। তার এ স্ত্রী তাকে সৌভাগ্যবান বানাতে পারে না। নারীরা পাপাচারের কেন্দ্র বিন্দু; তাদের পাপাচারের কারণেই আমাদের

---

[34] Epstein, op. cit., p. 196.

সবাইকে মরতে হবে। খারাপ স্ত্রীকে যা খুশি তা বলতে দিও না। যদি সে তা মেনে না নেয় তাহলে তালাক দিয়ে তার থেকে মুক্ত হও"। (এক্সিলেসিয়াসটিকাস: ২৫/২৫)

ইয়াহূদী ধর্ম গ্রন্থ তালমুদে তালাক বৈধ হওয়ার কিছু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যার কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে "যদি সে রাস্তায় খাওয়া দাওয়া করে। ইয়াহূদী পণ্ডিত 'মায়ার' বলেন উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া আবশ্যক"। (তালমুদ: গিট্টিন ৮৯ A)

যে বন্ধ্যা স্ত্রীর দশ বছর যাবত কোনো সন্তান হয় না তাকে বাধ্যতামুলক তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তালমুদ। ইয়াহূদী পণ্ডিত বলেন, "কোনো নারীর বিবাহের পর দশ বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান না হলে তাকে যেন স্বামী তালাক দিয়ে দেয়"। (Yeb 64 A)

কিন্তু, ইয়াহূদী আইনে মহিলার কোনো অধিকার নেই তালাক চাওয়ার, তবে আদালতে শক্তিশালী কোনো কারণ দেখাতে পারলেই (যা দ্বারা তালাক পাওয়ার দাবিদার

সাব্যস্ত হয়) শুধুমাত্র ইয়াহূদী নারীরা তালাক পেতে পারে। যে সমস্ত কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে সেগুলো হচ্ছে-

১. স্বামী যদি শারিরীক কোনো অংগ-প্রত্যংগের বা ত্বকের কোনো রোগে ভুগতে থাকে।

২. স্বামী যদি পরিবারের খাদ্যের বন্দোবস্ত না করতে পারে ইত্যাদি।

এ সময় আদালত তার তালাকের আবেদন গ্রহণ করবে। মহিলা কখনও তালাকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না; বরং শুধুমাত্র স্বামীই তার স্ত্রীকে তালাকের কাগজপত্র দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এ অবস্থায় আদালত স্বামীকে তালাকে বাধ্য করতে কিছু শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে। যেমন-জরিমানা করা, জেলে আটক রাখা, গীর্জায় প্রবেশে বাধা দেওয়া ইত্যাদি। যাতে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে তালাক দিকে অস্বীকৃতি জানালে স্ত্রী সারাজীবন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। স্ত্রীকে সারা জীবন না বিবাহিত না

তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় থাকতে হতে পারে। তাদের নিয়ম অনুযায়ী এ অবস্থায় স্বামী অন্য কাউকে বিবাহ করে বা অন্য কোনো মহিলার সাথে অবৈধভাবে ঘর সংসার করতে পারে। কেননা,এ অবস্থায় সন্তান হলে তাদের দেশীয় আইনানুযায়ী তা বৈধ হিসেবে গণ্য হয়। স্ত্রী পড়ে থাকবে বিবাহবিহীন অবস্থায়। কারণ, সে এখনও পুর্ব স্বামীর সথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ বসলে সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে এবং সন্তান হলে তাদের পরবর্তী দশম প্রজন্ম পর্যন্ত সমস্ত সন্তান অবৈধ ঘোষিত হবে। এ স্ত্রীকে বলা হবে মুকাইইয়াদাহ বা আবদ্ধ।[35]

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এরুপ ১০০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত ইয়াহূদী মহিলা রয়েছে, যারা এভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। ইসরাঈলে আছে এ রকম ১৬০০০ মহিলা।

---

[35] Swidler, op. cit., pp. 162-163.

স্বামীরা তাদেরকে তালাক দেওয়ার নাম করে হাজার হাজার ডলার হাতিয়ে নেয়।[36]

ইসলাম উভয় ধর্মের সমস্যাগুলোর সমাপ্তি ঘোষণা করতে এগিয়ে আসল। ইসলামে বৈবাহিক বন্ধন একটি অত্যন্ত পবিত্র বন্ধন। শক্তিশালী কোনো কারণ ছাড়া যা ছিন্ন হবার নয়। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসেও ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে সুষ্ঠু ফয়সালায় বিশ্বাসী। সুষ্ঠু ফয়সালার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে শুধুমাত্র তখনই ইসলাম সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে তালাকের বৈধতা দেয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলাম তালাকের বৈধতা দেয়; কিন্তু তালাকের পথ রুদ্ধ করতে যা করা দরকার সবকিছু করে। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই তালাকের ক্ষমতা

[36] The Toronto Star, Apr. 8, 1995.

দিয়েছে। যা ইয়াহূদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর নারীদের তালাকের সে অধিকার হলো-‘খোলা’ করা।[37]

তালাক দেওয়ার পর স্বামীর কোনো অধিকার নেই স্ত্রীকে প্রদত্ত সম্পদ (উপহার ইত্যাদি) ফেরত নেওয়ার। তালাকের পর নারীকে প্রদত্ত সম্পদ ফেরত নেওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠﴾ [النساء: ٢٠]

“আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থানে অন্য স্ত্রীকে পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর

---

[37] Sabiq, op. cit., pp. 318-329. See also Muhammad al Ghazali, Qadaya al Mar'aa bin al Taqaleed al Rakida wal Wafida (Cairo: Dar al Shorooq, 4th edition, 1992) pp. 178-180.

মাধ্যমে গ্রহণ করতে চাও”? [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২০]

আর যদি স্ত্রী তার বিবাহকে ছিন্ন করতে চায়, তাহলে সে তার গৃহীত উপহার সামগ্রী স্বামীকে ফিরিয়ে দেবে। সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়াটা ন্যায় সংগত বিনিময় হিসেবে বিবেচিত হবে; কেননা স্বামী চায় তাদের বিবাহ বন্ধন টিকে থাকুক অপরদিকে স্ত্রী তা ছিন্ন করতে চায়। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রী যদি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তখন ছাড়া অন্য কোনো সময় স্বামীর জন্য বৈধ হবে না তাকে প্রদত্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩﴾ [البقرة: ٢٢٩]

“তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা কিছু প্রদান করেছ তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।

কিন্তু, যে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়েই ভয় করে যে তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে না, সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এটা হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। কাজেই এ সীমা অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই যালিম।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন মহিলা আসলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: আমি আমার বিবাহ বিচ্ছেদ চাই; কিন্তু, তিনি বর্ণনা করেন নি, কী কারণে তিনি তার বিবাহ বিচ্ছেদ চান। তার সমস্যা একটাই যে, তিনি তার সাথে জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«(أتردين عليه حديقته) . قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)»

“তুমি কি তাকে বাগান (বিবাহের সময় উপহার স্বরুপ প্রদত্ত) ফেরত দেবে? মহিলা বলল, হ্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বামীকে বললেন: বাগান নিয়ে নাও এবং তাকে একটি তালাক (শুধুমাত্র এক তালাক দিলে আবার ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না।) দিয়ে দাও।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৭৩)

এছাড়াও কোনো শক্তিশালী কারণে মহিলা তালাক দাবী করতে পারে। যেমন, স্বামীর কঠোরতা, বিনা কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করা বা পারিবারিক খরচ না চালানো ইত্যাদি। এ অবস্থায় ইসলামী আদালত মহিলাকে তালাকের ব্যাপারে ফয়সালা দেবে।[38]

সংক্ষেপে: ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে ‘খোলা’ বিধানের মাধ্যমে বা আদালতে অভিযোগ উথ্থাপনের মাধ্যমে। মুসলিম মহিলাকে কখনো আটকিয়ে

---

[38] Ibid., pp. 313-318.

রাখা (তালাক না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা) যায় না। ইসলাম আসার পর এ সকল অধিকার বলে ইয়াহূদী নারীরা ইসলামী আদালতে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তালাক দাবী করত। কিন্তু ইয়াহূদীরা তাদের তালাককে প্রত্যাখ্যান করে কিছু অধিকার দিয়ে কৌশলে ইসলামী আদালতে যাওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখল। খৃষ্টান সমাজের ইয়াহূদী মহিলারা এ অধিকারগুলো পেত না। কেননা ওখানকার রোমানীয় আইন ইয়াহূদী আইন থেকে উত্তম ছিল না।[39]

এখন আমরা দেখব ইসলাম তালাককে কীভাবে গ্রহণ করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধকাজ হচ্ছে তালাক। (আবু দাউদ)

[39] David W. Amram, The Jewish Law of Divorce According to Bible and Talmud (Philadelphia: Edward Stern & CO., Inc,. 1896) pp. 125-126.

নিছক অপছন্দের কারণে স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার। অপছন্দ হলেও ইসলাম স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾ [النساء: ١٩]

"স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

"কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে উপহাস না করে। যদি তার একটি আচরণ পছন্দ না হয়, তাহলে

আরেকটি আচরণে হয়ত সে সন্তুষ্ট হবে।” (সহীহ মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়ে বলেছেন: স্ত্রীর কাছে যার আচরণ উত্তম সেই পুর্ণ ঈমানদার। তিনি বলেন,

«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا . وخياركم خياركم لنسائهم»

“ঐ ব্যক্তি পূর্ণাংগ ঈমানদার যার আচার ব্যবহার উত্তম। আর যার আচার আচরণ স্ত্রীদের কাছে উত্তম সেই উত্তম ব্যক্তি।” (সহীহ তিরমিযী)

ইসলাম প্রাক্টিক্যাল ধর্ম তাই সে খেয়াল রাখে যে,কিছু কিছু পরিস্থিতিতে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করা সম্ভব হয় না এবং স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করেও লাভ হয় না; বরং একে অপরের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সে সময়ের জন্য স্বামীকে চারটি নসীহত পেশ করেছে। এ সময়কার করণীয় সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥﴾ [النساء: ٣٤، ٣٥]

“পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ তা‘আলা একের ওপর অন্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করতে যেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ। যদি তোমরা তাদের

মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশংকা কর, তবে তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। আল্লাহ তা‘আলা সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪-৩৫]

পুরুষের উচিৎ উপরোক্ত তিনটি নসীহত মেনে চলা। যদি তাতে কোনো কাজ না হয়, তখন এতে তার পরিবারকে জড়াবে। এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, স্ত্রী অবাধ্য না হলে স্বামীর জন্য কোনোভাবে উচিৎ হবে না তাকে প্রহার করা, তবে তাকে সংশোধন করতে গিয়ে জরুরি অবস্থায় প্রহার করা বৈধ। যদি এতে স্ত্রী সংশোধিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে পুর্বেকার কাজের জন্য তিরস্কার করা উচিৎ নয়। আর যদি সংশোধন না হয় তাহলে, দ্বিতীয়বার তাকে প্রহার করবে না; বরং উভয়ের পরিবার থেকে সদস্য নিয়ে সালিস বসবে। (প্রহার করলে তা হবে মৃদু আকারে অমানুষিকভাবে যেন না হয় যাতে ব্যাথা হয় এবং তা চেহারাসহ স্পর্শকাতর স্থানে হতে পারবে না।)

বিদায় হজের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন অত্যন্ত জরুরী অবস্থা (অশ্লীল কাজকর্ম বা কথায় জড়িত হওয়া ইত্যাদি) ছাড়া এ পর্যায়ে না আসে। এ অবস্থায়ও শাস্তিটা হবে খুবই সামান্য। নারী যদি এ কাজ থেকে বিরত হয় স্বামীর জন্য তার বিরুদ্ধে পুনরায় একশানে যাওয়া উচিৎ হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا».

“তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী রয়েছে। এটা ব্যতিত তোমাদের আর কোনো কিছু করার অধিকার নেই তবে, যদি তারা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে তাহলে, ভিন্ন কথা। যদি তারা এরূপ করে তাহলে, তাদেরকে বিছানা ত্যাগ কর, আর

তাদেরকে মৃদু প্রহার কর যেন তাদের শরীরে কোনো ব্যথা (অমানুষিক) না হয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো পন্থা অবলম্বন করতে যেও না। (তিরমিযী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কারণ ছাড়া স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একদল মহিলা এসে অভিযোগ করলেন যে, তাদের স্বামীরা তাদেরকে প্রহার করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার পরিজনের কাছে অনেক নারী এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। ঐ সমস্ত পুরুষেরা উত্তম নহে (যারা তাদের স্ত্রীদেরকে প্রহার করে)। (আবু দাউদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। (তিরমিযী)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ) নাম্নী মহিলাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে লোক স্ত্রীকে প্রহার করে বলে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে, তাদেরকে যেন বিবাহ না করে। উক্ত মহিলা নিজেই বর্ণনা করেন: মুয়াবিয়া ও আবু জাহাম আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আবু জাহাম! সে তো তার কাধ থেকে লাঠি নামায় না; আর মুয়াবিয়া দরিদ্র যার কোনো সম্পদ নেই......(সহীহ মুসলিম)

তালমূদ স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান করতে প্রহার করার অনুমতি দিয়েছে।[40]

বলা হয়েছে তাকে প্রহার করতে হলে পাপাচারী হওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং শুধুমাত্র গৃহাস্থলীর কাজকর্ম করতে অনীহা প্রকাশ করলেও তাকে প্রহার করা যাবে।তাকে

[40] David W. Amram, The Jewish Law of Divorce According to Bible and Talmud (Philadelphia: Edward Stern & CO., Inc,. 1896) pp. 125-126.

মৃদু নয় বরং তাকে বেত্রাঘাত করা ও খানাপিনা থেকে বিরত রাখারও অনুমতি দিয়েছে।[41]

কিন্তু স্বামীর আচরণ খারাপ হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨﴾ [النساء: ١٢٨]

অর্থাৎ কোনো মহিলা যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ বা এড়িয়ে চলা নীতি অবলম্বনের আশংকা করে। তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে নেয়াতে কোনো দোষ নেই। আর মীমাংসাই উত্তম কাজ। মানুষের আত্মার সামনে লোভ বিদ্যমান রয়েছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে জেনে

[41] Epstein, op. cit., p. 219.

রাখ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কাজের খোজ খবর রাখেন। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৮]

এ অবস্থায় নারীকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করে নিতে। (উভয় পরিবারের মধ্যস্থতায় বা তাদের মধ্যস্থতা ব্যতিত) নারীকে স্বামীর বিছানা থেকে পৃথক থাকা বা স্বামীকে প্রহার করার উপদেশ দেয় নি, যাতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এড়ানো যায়। কেননা তা তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ককে আরো বেশি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। কোনো কোনো আলিম মত প্রকাশ করেছেন যে, এ অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে মীমাংসার জন্য আদালত এগিয়ে আসবে। প্রথমে আদালত স্বামীকে সতর্ক করে দেবে অতঃপর স্বামী থেকে স্ত্রীকে দূরে রাখবে এবং সর্বশেষে আদালত স্বামীকে প্রহার করার হুকুম দেবে।[42]

সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, বৈবাহিক সম্পর্ককে অটুট রাখতে স্বামী স্ত্রীকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করবে। তাদের

---

[42] Ibid, pp 156-157.

কোনো একজন অপরের প্রতি খারাপ আচরণ করে থাকলে অন্যজন এ উপদেশগুলো কাজে লাগিয়ে তাদের এ পবিত্র বন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা করে যাবে। এ চেষ্টাগুলো ব্যর্থ হলে ইসলাম শেষ চিকিৎসা হিসেবে হৃদ্যতার সাথে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে অনুমতি দেয়।

মায়েরা

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (Old Testament) অনেক স্থানে পিতামাতার সাথে সৎব্যবহারের নির্দেশ এবং অসৎব্যবহার সম্বন্ধে সতর্কবাণী এসেছে। বলা হয়েছে- ”কোন মানুষ তার পিতামাতাকে গালি দিলে তাকে হত্যা করা হবে”। (**লেভিটিকাস**: ২০/৯)

জ্ঞানী পুত্র তার পিতাকে উৎফুল্ল করে আর মুর্খ ব্যক্তি মাতাকে অপমানিত করে”। (প্রভার্বস: ১৫/২০)

কিছু কিছু অধ্যায়ে বলা হয়েছে শুধুমাত্র পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে।

“জ্ঞানী পুত্র পিতার শাসনকে মেনে নেবে আর উপহাসকারী কারো ধমকের উপেক্ষা করে না”। (প্রভার্বস: ১৩/১)

কিন্তু, কোথাও আলাদাভাবে মাতাকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার হিসেবে উপস্থাপন করা হয় নি। এমনকি যে মাতা তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ, প্রসব ও দুধ খাইয়ে লালন পালন করেছেন কোথাও সে মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয় নি। মাতা তার সন্তানদের থেকে উত্তরাধিকার পায় না অথচ পিতা তার উত্তরাধিকার হয়।[43]

অন্যদিকে বাইবেলের নতুন নিয়মে (New Testament) মাকে কোনো মর্যাদা দেওয়া হয় নি। বরং মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারকে স্রষ্টার পথে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো খৃষ্টান যীশুর অনুসারী

---

[43] Muhammad Abu Zahra, Usbu al Fiqh al Islami (Cairo: al Majlis al A'la li Ri'ayat al Funun, 1963) p. 66.

বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে তার জন্মদাত্রী মাকে অপছন্দ করে। যীশুর নামে প্রচারিত আরেকটি কথা পাওয়া যায় "কোনো মানুষ যতক্ষন না তার পিতা, মাতা,স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ভাইবোনদেরকে অপছন্দ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমার ছাত্র বলে গণ্য হবে না"। (লুক: ১৪/২৬)

নতুন নিয়মের আরেকটি অধ্যায় রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে, যীশু তার মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন। উদাহরণ স্বরুপ যখন তিনি তার ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতেন তখন তার মা তাকে খোজ করলে তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। "তখন তার ভাতৃবর্গ ও মা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকত। একদল ছাত্র যারা তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন তারা বললেন: বাইরে আপনার মা ও ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছে তারা আপনাকে ডাকছে। তিনি তাদেরকে বলতেন কে আমার মা বা ভাই? তারপর উপবিষ্টদেরকে বলতেন: আমার মা ও ভ্রাতৃবর্গ! যারা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কাজ

করবে তারাই আমার ভাই, বোন বা মা”।[44] (মার্কস: ৩/৩১-৩৫)

অথবা কেউ বলল: ধর্মীয় শিক্ষা পরিবার পরিজন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যীশু তার মায়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার শিক্ষাদান কার্য অব্যাহত রাখলেন। অপর একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে- মায়ের মর্যাদা অনেক। তিনি সন্তানকে প্রসব করেছেন, তাকে লালন-পালন করেছেন মর্মে একজনের কথায় যীশু একমত পোষণ করেন নি । ‘যখন তিনি কথা বলছিলেন তখন সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন মহিলা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন যে, কতইনা সৌভাগ্য সে পেটের যে পেট আপনাকে ধারণ করেছে। কতই না সৌভাগ্য ঐ স্তনদ্বয়ের যার থেকে আপনি দুগ্ধ পান করেছেন। কিন্তু, তিনি বললেন: কতই না সৌভাগ্য তাদের যারা আল্লাহর কালাম শুনেছে ও তা আত্মস্থ করেছে’। (লুক: ১১/২৭-২৮)

---

[44] Epstein, op. cit., p. 122.

কুমারী মারইয়াম আলাইহাস সালামের মত সম্মানিতা নারীর সাথে যদি সম্মানিত ব্যক্তি যীশু এ রকম ব্যবহার করেন তাহলে, সাধারণ মা ও সাধারণ পুত্রের অবস্থা কী হতে পারে?

কিন্তু ইসলামে মায়েদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পরেই পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

“এবং তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে

‘উফ’ শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারমূলক কথা বল। তাদের সামনে মাথা অবনমিত হও এবং বল- হে আমার রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন, তারা আমাকে শৈশব কালে লালন-পালন করেছেন”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন অংশে মায়েদের সুউচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤﴾ [لقمان: ١٤]

আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করতে। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়। আমি নির্দেশ প্রদান করেছি যে,আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে

আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। [সূরা লোক্বমান, আয়াত: ১৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামে মায়ের মর্যাদাকে তুলে ধরেছেন।

হাদীসে এসেছে:

«جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال (أمك). قال ثم من؟ قال (ثم أمك). قال ثم من؟ قال (ثم أمك) . قال ثم من ؟ قال (ثم أبوك)»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাল আচরণ পাওয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন: তোমার মা। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: তোমার মা। আগন্তুক চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলেন:

তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার পিতা। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

মুসলিমরা তাদের মায়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকে। সব সময়ই মুসলিম ছেলে-মেয়ে ও মায়েদের মধ্যকার মধুর সম্পর্ক এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা দেখে পশ্চিমারা রীতিমত অবাক হয়ে যায়।

উত্তরাধীকার সম্পদে নারী

নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর পর তাদের সম্পদে নারীদের পাপ্য সম্পর্কে কুরআন ও বাইবেলে মতবিরোধ রয়েছে। ইয়াহূদী পণ্ডিত এপস্টাইন নারীদের উত্তরাধিকার বিষয়ে বলেন, “বাইবেল নাযিল হওয়ার পর থেকেই নিকটাত্মীয়দের সম্পদে মহিলা তথা স্ত্রী ও কন্যার কোনো অধিকার ছিল না। মহিলা নিজেও উত্তরাধিকারী সম্পদের অংশ বলে বিবেচিত হত, তবে তার কোনো অধিকার ছিল না ঐ সম্পদে। অপরদিকে মূছা আলাইহিস সালাম এর শরী‘আতে অন্য কোনো সন্তান না থাকলে কন্যাদেরকে

ওয়ারিস গণ্য করা হত। কিন্তু স্ত্রী এ সম্পদ থেকে কিছুই পেত না”।[45]

কেন মহিলা উত্তরাধিকারী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে? এর জবাবে এপস্টাইন বলেন, সে উত্তরাধিকার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা সে বিবাহের পূর্বে পিতার ও বিবাহের পরে স্বামীর মালিকানাধীন সম্পদ (পণ্য) হিসেবে গণ্য হয়”।[46]

বাইবেলে উত্তরাধিকারের আইন লিপিবদ্ধ আছে। (নং ২৭/১-১১) স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি। অথচ স্ত্রী মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তার সম্পদে সর্বাগ্রে অধিকার রয়েছে স্বামীর। এমনকি পুত্রদের আগেই স্বামীর অধিকার দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো সন্তান না থাকলে কন্যাগণ ওয়ারিস হবে। মায়েরও কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি উত্তরাধিকারী সম্পদে। মৃত ব্যক্তির যদি কোনো সন্তান থাকে তাহলে

---

[45] Armstrong, op. cit., p. 8.

[46] Epstein, op. cit., p. 175.

বিধবা ও তার কন্যাগণ তাদের দয়ার মুখাপেক্ষী থাকবে। এজন্য ইয়াহূদী সমাজে দেখা যায়- কন্যা সন্তান ও বিধবাগণ হয় সমাজের দরিদ্র শ্রেণী। খৃষ্টান সমাজ বহুকাল যাবত উপরের বিধানই পালন করে এসেছে। রাষ্ট্রীয় আইন ও গীর্জার ধর্মীয় আইন নারীদেরকে তাদের পিতার সম্পদে ওয়ারিস হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছিল। স্ত্রীর ও কোনো অধিকার ছিল না স্বামীর সম্পদে । বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এ ধরণের কঠোর আইন প্রচলিত ছিল।[47]

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা নারীদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করত। ইসলাম এ ধরণের সমস্ত অত্যাচারী আইন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীদেরকে তাদের নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ নিশ্চিত করেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[47] Ibid., p. 121.

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَّفۡرُوضًا ٧﴾ [النساء: ٧]

"পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক বা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭]

ইউরোপীয়রা এগুলো শেখার কয়েকশত বছর আগে থেকেই মুসলিম মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোনেরা তাদের আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে অধিকার ভোগ করে আসছে।[48]

আল-কুরআনে ওয়ারিসদের অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে বিস্তারিত ভাবে। (দেখুন: সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭, ১১, ১২ ও ১৭৬) কয়েকটা অবস্থা ব্যতিত নারীর সে অংশ হচ্ছে পুরুষের অর্ধেক। ব্যতিক্রম অবস্থার মধ্যে

---

[48] Gage, op. cit., p. 142.

একটি হচ্ছে পিতা। সে মাতার সমান অংশ পাবে। আমরা এ কথাটি বললে মনে হবে যেন ইসলাম এটা যুলুম করেছে। অথচ, আমরা যদি তার কারণ খুজতে যাই তাহলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে পুরুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে। (দেখুন: স্ত্রীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব অধ্যায়)

স্বামী তার স্ত্রীকে যে উপহার দিবে তালাক দিলেও সে উপহারের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে স্ত্রীর। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে উপহার দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর খরচ বহন করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রীর ওপর এ সমস্ত খরচের কোনো দায়-দায়িত্ব নেয়, তবে নিজে করতে চাইলে আলাদা কথা। তার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদে রয়েছে তার একচ্ছত্র মালিকানা। ইসলাম বিবাহকে পবিত্র বন্ধন হিসেবে আখ্যা দিয়ে যুবকদেরকে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং তালাকের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে দিয়েছে। বৈরাগ্যকে ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয় নি। ফলে মুসলিম সমাজে বিবাহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং সে সমাজে বৈরাগী খুব কমই দেখা যায়। নারীদের চেয়ে পুরুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব অনেক বেশি। তাই সমস্ত মতবিরোধ থেকে বেরিয়ে এসে উত্তরাধিকারী সম্পদের বিধানে সমতা স্থাপন করা হয়েছে। এক ইংরেজ মুসলিম মহিলা বলেছিলেন: ইসলাম শুধু নারীর প্রতি ইনসাফ করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং তাকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে।[49]

বিধবার সমস্যা সংকুল জীবন

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অনুযায়ী মহিলাকে উত্তরাধিকারী সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে ইয়াহূদী সমাজে বিধবারা থাকে অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায়। স্বামীর আত্মীয় স্বজন তার খরচাদির ব্যবস্থা করলেও তার নিজের হাতে কোনো শক্তি নেই তাদেরকে খরচে বাধ্য করার, বরং তাদের অনুগ্রহের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। এজন্য

[49] B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, Woman in Islam (London: Islamic Foundation, 1978) p. 23.

ইসরাইলে বিধবাগণ সমাজে সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণির হয়ে থাকে। (ইশইয়া: ৫৪/৪)

কিন্তু বিধবাদের সমস্যার এখানেই শেষ নয়; বরং বাইবেলে (জেনেসিস: ৩৮) এসেছে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সন্তানহীনা হলে স্বামীর ভাইয়ের সাথে বিবাহ বসবে যদিও সে বিবাহিত হয়। উদ্দেশ্য হলো তার ভাইয়ের যেন সন্তান হয় এবং তার নাম মরার পরেও সমাজে বেচে থাকে।

ইয়াহুযা আওনানকে বললেন: 'তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে যাও, তাকে বিবাহ কর এবং তোমার ভাইয়ের বংশকে রক্ষা কর'। (জেনেসিস: ৩৮/৮)

বিধবা নারীকে এ বিবাহে দ্বিমত করার কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি। তাকে শুধুমাত্র মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। তার দায়িত্ব শুধু তার মৃত স্বামীর বংশ রক্ষা করা। আজও ইসরাইলে এ প্রথাই চালু রয়েছে।

বিধবা মহিলা তার স্বামীর ভাইয়ের অংশের উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। স্বামীর ভাই যদি ছোট হয় তাহলে তার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী অপেক্ষা করবে। ভাই যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু তখনই সে স্বাধীন বলে গণ্য হবে এবং যাকে খুশি বিবাহ করতে পারবে। এ জন্যই স্বামীর ভাই কর্তৃক বিধবার স্বাধীনতা খর্ব করার রীতি ব্যাপকতা লাভ করেছে।

ইসলাম পুর্ব যুগে প্রায় এ ধরণেরই প্রথা চালু ছিল। তখন বিধবারা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হত এবং তার পুরুষ আত্মীয় স্বজন তাতে অংশীদার হত। তখন আরো একটি প্রচলন ছিল, মৃত ব্যক্তির জেষ্ঠপুত্র তার সৎ মাকে বিবাহ করত। আর-কুরআনে এ সকল প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ۝٢٢﴾ [النساء: ٢٢] "তোমাদের পিতাগণ যে মহিলাদেরকে বিবাহ করেছেন, তোমরা

তাদেরকে বিবাহ করো না। তবে যা বিগত হয়ে গেছে তা আলাদা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২২]

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ ইয়াহূদী ধর্মে ঘৃণার পাত্র। গীর্জার ধর্মীয় পন্ডিতের জন্য বৈধ নয় কোনো বিধবা,তালাক প্রাপ্তা বা ব্যভিচারী নারীকে বিবাহ করা। ‘ধর্মীয় পণ্ডিত কুমারী নারীকে বিবাহ করবে। বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা ব্যভিচারী নারীকে বিবাহ করবে না; বরং নিজের জাতির কুমারীকে বিবাহ করবে। তার বংশকে কালিমালিপ্ত করবে না কেননা আমি পালনকর্তা পবিত্রকারী। (লেভিটিকাস: ২১/১৩-১৫)

বর্তমানে ইসরাঈলে পৌত্তলিক আমলের বড় বড় যাদুকরদের বংশ বর্তমান রয়েছে। তাদেরও অনুমতি নেই কোনো বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা বা ব্যভিচারী নারীকে বিবাহ করার।[50]

---

[50] Hazleton, op. cit., pp. 45-46.

ইয়াহূদী ধর্মে কোনো মহিলা তিনবার বিবাহ করার পর আবার বিধবা হলে (তিনজন স্বামীই যদি মারা যায়) তাকে "হত্যাকারীনী" হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। তাকে আবার পুনরায় বিবাহ করার অধিকার দেওয়া হয় না।[51]

কিন্তু আর-কুরআনে এগুলোর কিছুই নেই। বরং মুসলিম বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে খুশি তাকেই বিবাহ করতে পারে। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তাকে কোরআনের কোথাও ঘৃণার চোখে দেখা হয় নি।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١﴾ [البقرة: ٢٣١]

51 Ibid., p. 47.

“আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও (এক বা দুই তালাক), অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে নেয়,তখন তোমরা নিয়মানুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও অথবা সহানুভুতির সাথে মুক্ত করে দাও। তোমরা তাদেরকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর,যা তোমাদের ওপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর,যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে; যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে,আল্লাহ তা‘আলা সর্ব বিষয়েই জ্ঞানময়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩১]

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٣٤﴾ [البقرة: ٢٣٤]

“আর তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং তাদের নিজেদের স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেরা চারমাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা (ঈদ্দত পালন) করবে। তারপর যখন ইদ্দত পুর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসংগত ব্যবস্থা নিলে কোনো পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٤٠﴾ [البقرة: ٢٤٠]

"আর যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যাবে, তখন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর,যদি স্ত্রীরা নিজে থেকেই বের হয়ে যায়, তাহলে সে যদি নিজের ব্যাপারে কোনো উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৪০]

বহুবিবাহ

এবার আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোচনা করব তা হলো বহুবিবাহ। বহুবিবাহ একটি পুরাতন রীতি যা বহু সম্প্রদায়েই পাওয়া যেত। বাইবেলেও বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয় নি। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে (OldTestament) ও ইয়াহূদী পণ্ডিতদের লেখনীতে সর্বদা বহুবিবাহের বৈধতার কথা লক্ষ করা যায়। বলা হয় যে, নবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর নিকট ৭০০ স্ত্রী ও ৩০০ দাসী ছিল। (১, কিংস: ১১/৩) আর দাউদ

আলাইহিস সালাম এরও বেশ কিছু স্ত্রী ও দাসী ছিল। (২, সামুয়েল: ৫/১৩)

পুরাতন নিয়মে (Old Testament) পিতার উত্তরাধিকারী সম্পদে পুত্র এবং একাধিক স্ত্রীদের অংশ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। (ডিউটারনমী: ২২/৭)

তবে শুধুমাত্র স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে।(লেভিটিকাস: ১৮/১৮) ইয়াহূদী ধর্মগ্রন্থ তালমুদে বলা হয়েছে: "স্ত্রীদের সংখ্যা যেন কোনো ক্রমেই চারের বেশি না হয়"।[52]

ইউরোপের ইয়াহূদীরা ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহুবিবাহের প্রথা চালু রেখেছিল। আর প্রাচ্যের ইয়াহূদীরা ইসরাইলে (যেখানে বিহুবিবাহ নিষিদ্ধ) আসার আগ পর্যন্ত এটা অব্যাহত রেখেছিল। তবে তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী বহুবিবাহ এখনও বৈধ।[53]

---

[52] Ibid., p. 49.

[53] Swidler, op. cit., pp. 144-148.

বাইবেলের নতুন নিয়মে (New Testament) এ ব্যাপারে কি বলা হয়েছে? আসুন দেখে নেওয়া যাক। 'ইউহান্না হিলমান' তার কিতাবের "বহুবিবাহ নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা" শিরোনামে লিখেছেন-"বহুবিবাহ সম্বন্ধে নতুন নিয়মে (New Testament) কোনো নির্দেশও দেওয়া হয় নি আবার নিষিদ্ধও করা হয় নি"।[54]

তৎকালীন ইয়াহূদী সমাজে বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্বেও ঈসা আলাইহিস সালাম বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নি। "ইউহান্না হিলমান" আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিয়ে বলেছেন: রোমের গীর্জা থেকেই বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইউনানী-রোমানীয় কৃষ্টি-কালচারের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। এ কৃষ্টি-কালচার একজন মাত্র স্ত্রী রাখার বৈধতা দেয় এবং ব্যভিচারকে স্বীকৃতি দেয়। তিনি তার কথার স্বপক্ষে পণ্ডিত এজেস্টাইনের কথা তুলে ধরেন। 'বর্তমানে

---

[54] Hazleton, op. cit., pp 44-45.

আমাদের উচিৎ রোমানীয় সভ্যতাকে অনুসরণ করা সুতরাং দ্বিতীয় বিবাহকে আর বৈধতা দেওয়া হবে না’।[55]

আফ্রিকার গীর্জাগুলোর পক্ষ থেকে প্রায়ই বলা হয় যে, ইউরোপীয় খৃষ্টানরা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে রোমানীয় সভ্যতার সাথে তাল মেলানোর জন্য ধর্মের কোনো কারণে নয়।

আল-কুরআনেও বহুবিবাহের স্বীকৃতি দেয়, তবে তা শর্ত সাপেক্ষে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣﴾ [النساء: ٣]

---

[55] Eugene Hillman, Polygamy Reconsidered: African Plural Marriage and the Christian Churches (New York: Orbis Books, 1975) p. 140.

“যদি তোমরা এতিমদের সাথে ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে আশংকা কর তাহলে,মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করে নাও। আর যদি আশংকা কর যে,তাদের সাথে ন্যায়সংগত আচরণ করতে পারবে না তবে, একটিই বা তোমাদের অধিকার ভূক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

কুরআন বাইবেলের বিপরীত। কুরআন বহুবিবাহের সীমা নির্ধারন করে দিয়েছে চারটি পর্যন্ত ন্যায়বিচারের শর্তে। কুরআন কোথাও মুসলিমদেরকে বহুবিবাহ করতে উৎসাহ দেয় নি; বরং অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু, কেন? কেন বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে? উত্তর ছোট্ট। তাহল: কিছু কিছু সময় ও স্থানে এগুলো সামাজিক কারণেই জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। আগের আয়াতেও বলা হয়েছে ইয়াতীম ও বিধবাদের কারণে বহুবিবাহকে বৈধ করা হয়েছে। আর ইসলাম সর্বযুগের সর্বকালের সর্বস্থানের জন্য অত্যাধুনিক।

অধিকাংশ সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি থাকে। আমেরিকাতে নারীর সংখ্যা রয়েছে পুরুষের চেয়ে কমপক্ষে আশি লক্ষ বেশি। গিনিয়াতে প্রতি ১০০ পুরুষের জন্য রয়েছে ১২২ জন মহিলা। তানজানিয়ায় প্রতি ১০০ জন মহিলার জন্য রয়েছে ৯৫.১০ জন পুরুষ।[56]

এ সমস্যা সমাধানে সমাজের কি করা উচিৎ? এর অনেকগুলো সমাধান আছে। কেউ কেউ বলে: তারা অবিবাহিত থেকে যাবে। অন্যরা বলেন, জীবন্ত কবর দিতে হবে। (বর্তমান সমাজেও কিছু কিছু সমাজে এর প্রচলন লক্ষ করা যায়।) কোনো কোনো সমাজ যিনা-ব্যভিচারকে বৈধতা দেয় ইত্যাদি।

তবে আফ্রিকার অধিকাংশ সমাজে বহুবিবাহের বৈধতা রয়েছে। পশ্চিমারা অনেকেই মনে করেন যে, বহুবিবাহ নারীর জন্য অপমানকর। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো সমাজের মেয়েরা বহুবিবাহকে সমর্থন করে থাকেন, এতে পশ্চিমারা রীতিমত আশ্চর্য হয়। আফ্রিকার অধিকাংশ

[56] Ibid., p. 17.

যুবতী নারী তার বিবাহের জন্য বিবাহিত পুরুষকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কেননা তারা বুঝতে পারেন যে, উক্ত স্বামী তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম। প্রচুর সংখ্যক আফ্রিকান মহিলা নিসঙ্গতা কাটাতে স্বামীদেরকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন।[57]

নাইজেরিয়ায় ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স্ক ৬০০০ মহিলার মধ্যে প্রায় ৬০% তার স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধা দেন না। আর ২৩% মহিলা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কেনিয়ার ৭৬% মহিলা বহুবিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন না। কেনিয়ার গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক ২৭ জন মহিলার মধ্যকার ২৫ জন মহিলা বহুবিবাহকে প্রাধান্য দেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তারা মনে করে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করলে বাড়ীতে তাদের ওপর কাজের চাপ কমে যাবে।[58]

আফ্রিকার অধিকাংশ সমাজেই বহুবিবাহ বৈধ রয়েছে। এমনকি 'প্রটেস্টেন্ট গীর্জা'ও এটাকে বৈধতা দেয়।

---

[57] Ibid., pp. 88-93.

[58] Ibid., pp. 92-97.

উচ্চপদস্থ এক ইংরেজ খৃষ্টানযাজক কেনিয়াতে বলেছেন: যদিও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মাঝে মহব্বত পয়দা হয় তবে, গীর্জা চিন্তা করে যে,অনেক সমাজে মহিলারা বহুবিবাহকে সাদরে গ্রহণ করছে এবং এ বহুবিবাহ প্রথা খৃষ্টান ধর্মবিরোধী নয়।[59]

“আফ্রিকায় বহুবিবাহ” প্রথার ওপর গবেষণা করে খৃষ্টান পাদ্রী “ডেভিড জেতারী” বলেছেন: তিনি তালাক ও পুনর্বিবাহের চেয়ে তালাকপ্রাপ্তা নারী ও শিশুদের দিকে লক্ষ্য করে বহুবিবাহকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।[60]

আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেক মহিলাকে চিনি যারা দীর্ঘদিন থেকেই পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থান করছেন। তারা বহুবিবাহ বিরোধী নন। তাদের মধ্যকার একজন যিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন তিনি তার স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করার

---

[59] Philip L. Kilbride, Plural Marriage For Our Times (Westport, Conn.: Bergin & Garvey, 1994) pp. 108-109.

[60] The Weekly Review, Aug. 1, 1987.

পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে সন্তান পালনে তাকে বেগ পেতে না হয়। পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা খুব বেশি দেখা যায় যুদ্ধের সময়। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান সপ্রদায়ের লোকেরা এ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুগত। এ সম্প্রদায়ের মহিলারা অবৈধ সম্পর্কের চেয়ে বহুবিবাহকেই বেশি অগ্রধিকার দিত। অপরদিকে ইউরোপের উপনিবেশবাদীরা অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা দেখিয়ে না দিয়েই “অসভ্য” আখ্যায়িত করে বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[61]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে পুরুষের চেয়ে মহিলা ছিল ৭৩,০০,০০০ বেশি। তন্মধ্যে ৩৩ লক্ষ বিধবা।

[61] 59. Kilbride, op. cit., p. 126.

সেখানে ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী ১০০ জন পুরুষ ছিল সমবয়সী ১৭৬ জন মহিলার বিপরীতে।[62]

সে সময় তাদের মধ্যকার অনেকেই পুরুষের প্রতি শুধু জীবনসঙ্গী হিসেবে নয়; বরং অভাবের তাড়নায় ভরনপোষণকারী হিসেবেও তাদের মুখাপেক্ষী ছিল। বিজয়ী সেনারা এ সমস্ত মহিলাদের থেকে সুবিধা ভোগ করত। প্রচুর সংখ্যক যুবতী ও বিধবা মহিলা দখলদার সেনাদের সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের অধিকাংশ সৈন্য তাদের সাথে অবৈধ দৈহিক মেলামেশা করে বিনিময়ে তাদেরকে সিগারেট, চকোলেট বা রুটি প্রদান করত। ছোট্ট বাচ্চারা এ উপহার গুলো পেয়ে খুশি হত। ১০ বছর বয়সী একজন শিশু সমবয়সী শিশুদের কাছে এ ধরণের উপহার দেখে আকাংখ্যা করত কোনো ইংরেজ যদি তার মাকে

---

[62] John D'Emilio and Estelle B. Freedman, Intimate Matters: A history of Sexuality in America (New York: Harper & Row Publishers, 1988) p. 87.

এ ধরণের কিছু দিত তাহলে তারা ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত।[63]

আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করি- নারীর জন্য কোনোটা কল্যাণকর? স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ যেটার প্রচলন রয়েছে রেড ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মাঝে; নাকি সভ্যতার দাবিদার পশ্চিমা সেনাদের মতো ব্যভিচারে? অন্য কথায়, কোনো সিস্টেমটা নারীর জন্য সন্মানের আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কুরআনের বিধান, নাকি রোমান সাম্রাজ্যের জারিকৃত বিধান?

১৯৪৮ সালে জার্মানীর মিউনিখে "পুরুষের চেয়ে নারী বেশি হয়ে যাওয়ার সমস্যা" নিয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যোগদানকারীদের মাত্র কয়েকজন বহুবিবাহের পক্ষে মত দেওয়া ছাড়া তারা আর কোনো সমাধানে পৌছতে পারেনি। অন্যরা তাদের মতের বিরুদ্ধে গর্জে

[63] Ute Frevert, Women in German History: from Bourgeois Emancipation to Sexual Liberation (New York: Berg Publishers, 1988) pp. 263-264.

উঠেছিল। পরে এটার ওপর গবেষণা করে তারা সবাই একমত হলো যে, এটা ছাড়া উদ্ভুত সমস্যার আর কোনো সমাধান নেই; এটাই একমাত্র সমাধান। পরে কনফারেন্স থেকে পরবর্তীতে বহুবিবাহকে সমর্থন করে মতামত প্রদান করা হয়।[64]

বর্তমানে বিশ্ব ব্যাপক ধ্বংসাত্বক অস্ত্রে ভরপুর। আজ হোক কাল হোক অচিরেই ইউরোপীয় খৃষ্টানরা বহুবিবাহকে তাদের সমস্যার একমাত্র সমাধান বলে মেনে নেবে। এ বাস্তবতাকে বুঝতে পেরেছেন পণ্ডিত “হিলমান”। **তিনি** বলেন, ধ্বংসাত্বক অস্ত্র (পরমানু ও রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি) ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হবে। ফলে, বহুবিবাহ প্রথা অবলম্বন করা জরুরি হয়ে পড়বে, অন্যথায় জাতি চরম সংকটে পড়ে যাবে। এ অবস্থায় ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও গীর্জা নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও

[64] Ibid., pp. 257-258.

কারণ দেখিয়ে “বিবাহ” সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করবে”।[65]

বহুবিবাহ আজকাল সমাজের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে দেখা দিয়েছে। কুরআনে বহুবিবাহের যে শর্ত দেওয়া হয়েছে আজকাল পশ্চিমা সমাজে আফ্রিকার তুলনায় বেশি পরিমাণে প্রচলিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। তাদের মধ্যকার গড়ে প্রতি ২০ জনে একজন যুবক তার ২১তম বছর পুর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়।[66]

তাদের অনেকেই হত্যার শিকার হয় আর অন্যরা অকর্মন্য, কারারুদ্ধ বা মদ্যপ হয়ে থাকে।[67]

---

65 Sabiq, op. cit., p. 191.

66 Hillman, op. cit., p. 12.

67 Nathan Hare and Julie Hare, ed., Crisis in Black Sexual Politics (San Francisco: Black Think Tank, 1989) p. 25.

এ ছাড়াও প্রতি চারজন মহিলার একজন ৪০ বছর বয়সেও অবিবাহিত থাকে। আর শেতাঙ্গদের মধ্যকার প্রতি দশজনে একজন অবিবাহিত থাকে।[68]

অনেক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ২০ বছরের আগেই সন্তানের মা হয়ে যায় এবং তারা ভরনপোষণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। এর ফলে একজন বিবাহ করে অথচ তার স্ত্রী তা জানে না।[69]

এ সমস্যা মোকাবেলা করতে আফ্রো-আমেরিকানদেরকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।[70]

সে সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায় "অংশীদারিত্বের বিবাহ" (পুরুষ কাউকে বিবাহ করবে অথচ, স্ত্রী তা জানবে না) বৈধতার পক্ষে একমত হয়েছে যা স্ত্রী ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ সমস্যা নিয়ে ১৯৯৩ সালের ২৭ শে

---

[68] Ibid., p. 26.

[69] Kilbride, op. cit., p. 94.

[70] Ibid., p. 95.

জানুয়ারী “টেম্পল ফিলাডেলফিয়া” বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কনফারেন্স হয়েছে।[71]

অনেকেই এ সমস্যার সমাধান হিসেবে বহুবিবাহের বৈধতা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তারা বিশেষভাবে যে সমাজে ব্যভিচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল সেখানে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না করার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জনৈক মহিলা বললেন: আফ্রো-আমেরিকানদের উচিৎ আফ্রিকাকে অনুসরণ করা যারা বহুবিবাহকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

রোমান ক্যাথলিক এনথ্রোপোলজী (নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান) বিশেষজ্ঞ “ফিলিপ কালব্রাইট” তার “বর্তমান যুগে বহুবিবাহ” নামক গ্রন্থে (যা খৃষ্টানদের মাঝে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে) লেখেন: আমেরিকান সমাজের বহু সমস্যার সমাধান রয়েছে বহুবিবাহের মধ্যে। এটা তালাক সমস্যার সমাধান করবে যা শিশুদের ওপর অতিমাত্রায় খারাপ প্রভাব ফেলে। আমেরিকান সমাজের অধিকাংশ

---

[71] Ibid.

তালাকের ঘটনা ঘটে থাকে নারী পুরুষের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপকতার ফলে। এ সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে বহুবিবাহ প্রথাকে বৈধ করা জরুরী। তালাকের চেয়ে এ পন্থাটা উত্তম। শিশুদেরকে রক্ষা করার জন্য এটা সর্বোত্তম পন্থা। তিনি আরো বলেন, সমাজে পুরুষ কম থাকার কারণে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীরা যে সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে, বহুবিবাহ এ সমস্যার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। আফ্রো-আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত "অংশীদারী বিবাহ" (স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করবে আগের স্ত্রীর অজান্তে) করার কোনো প্রয়োজন হবে না।[72]

১৯৮৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছিল নারীর সংখ্যা কম থাকায় "আইন কর্তৃক পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে" অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বহুবিবাহের পক্ষে মতামত প্রদান করে। একজন ছাত্রী বলল: তার (তার স্বামী বহুবিবাহ

---

[72] Ibid., pp. 95-99.

করলে) জন্য উত্তম হবে এবং তার মানসিক চাহিদা পুরণে সহায়ক হবে।[73]

আমেরিকাস্থ “মর্মন” নামক ধর্মগোষ্টির একদল মহিলা বহুবিবাহকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কেননা স্ত্রীরা সন্তান লালন-পালনে সহযোগিতা করে থাকে।[74]

ইসলামে বহুবিবাহ হয় উভয়পক্ষের ঐক্যমতে। কারো অধিকার নেই কোনো মহিলাকে বিবাহিত পুরুষের সাথে জোর করে বিবাহ দেবে। মহিলারও অধিকার আছে সে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করবে।[75]

কিন্তু, বাইবেলে একদিকে বহুবিবাহের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে স্বামীর ভাইয়ের সাথে, (বিবাহিত হলেও) যখন বিধবা মহিলা সন্তানহীনা হয়। (দেখুন: বিধবার সমস্যা সংকুল জীবন অধ্যায়)

---

[73] 71. Ibid., p. 118.

[74] Lang, op. cit., p. 172.

[75] Kilbride, op. cit., pp. 72-73.

মহিলার কোনো অধিকার নেই তার স্বামীর ভাইয়ের সাথে বিবাহ বসায় দ্বিমত করার। (জেনেসিস: ৩৮/৮-১০)

উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে বহুবিবাহ তেমন খুব একটা চোখে পড়ে না। কেননা নারী পুরুষের সংখ্যার মধ্যকার পার্থক্যটা উদ্বেগজনক নয়। তাই, আমরা বলতে পারি যে, পশ্চিমাদের অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপকতার তুলনায় মুসলিম বিশ্বে বহুবিবাহের সংখ্যা অতি নগণ্য।

বিখ্যাত প্রটেস্টানী খৃষ্টান ‘বেলী গ্রাহাম’ বলেন, সমাজকে বাচিয়ে রাখার স্বার্থেই বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা খৃষ্টানদের উচিৎ হবে না। ইসলাম সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যেই বহুবিবাহকে বৈধ করেছে এবং নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে জীবনসঙ্গীকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছে। খৃষ্টান সমাজের প্রত্যেক পুরুষ একটি মাত্র বিবাহ করে ঠিকই কিন্তু পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্কের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবেই দয়া ও উদারতার ধর্ম ইসলাম পুরুষকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিলেও পুরুষ মহিলার মধ্যকার গোপন সম্পর্ক

পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্যভিচারের মরণ ছোবল থেকে সমাজকে বাচিয়ে রাখতে। এবং সমাজের স্থিতিশীলতা টিকিয়ে রাখার গ্যারান্টি দিয়েছে।[76]

কিন্তু, অনেক মুসলিম ও অমুসলিম দেশ আজ বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি সেখানে প্রথম স্ত্রীর অনুমতিতে হলেও দ্বিতীয় বিবাহ আইনানুগ অবৈধ বিবেচিত হয়। তবে স্ত্রীর অজান্তে বা তার সাথে প্রতারণা করে অপর মহিলাকে বিবাহ করা আইন অনুযায়ী বৈধ। এ ধরণের দ্বিমুখী আইনের স্বার্থকতা কী? আইন কি মানুষের সাথে প্রতারণাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে? বর্তমান সময়ে সভ্যতার দাবিদারদের দ্বিমুখী নীতিসমূহের মধ্যে এটাও একটা আজব নীতি।

পর্দা বিধান

সর্বশেষে, আসুন! আমরা পশ্চিমাবিশ্ব নারীদের ওপর কঠোরতার প্রমাণ হিসেবে যে পর্দা বিধান নিয়ে আপত্তি

---

[76] Sabiq, op. cit., pp. 187-188.

তুলে সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করি। খৃষ্টান বা ইয়াহূদী ধর্মে কি পর্দার কোনো বিধান নেই? ইয়েশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাইবেল শিক্ষা' বিভাগের প্রফেসর ড. মিনাখিম এম. ব্রায়ার তার গ্রন্থ 'ইয়াহূদীদের আইনে ইয়াহূদী মহিলা' তে লিখেছেন: 'ইয়াহূদী মহিলারা মাথা ঢেকে বাইরে যেতেন। মাঝে মাঝে তা একটি চক্ষু ছাড়া তাদের পুর্ণাংগ চেহারা ঢেকে ফেলত'।[77]

তিনি তার কথার প্রমাণ দিতে গিয়ে পুর্ববর্তী বিখ্যাত ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কথা নিয়ে এসেছেন। তন্মধ্যে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কন্যাগণ মাথা খোলা রেখে রাস্তায় বের হতেন না। ঐ পুরুষের ওপর লা'নত (অভিশাপ) যে তার স্ত্রীকে খোলা মাথায় রাস্তায় ছেড়ে দেয়। কোনো মহিলা সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্যে মাথার চুল ছেড়ে দিলে তা দারিদ্রতার কারণ হয়। ইয়াহূদী পণ্ডিতদের আইন অনুযায়ী বিবাহিত মহিলার উপস্থিতিতে (যে তার চুল

---

[77] Abdul Rahman Doi, Woman in Shari'ah (London: Ta-Ha Publishers, 1994) p. 76.

অনাবৃত রেখে দিয়েছে) নামাজের ভিতরে বা বাইরে ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তি করা নিষিদ্ধ। মাথা অনাবৃত রাখাকে উলঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়।[78]

প্রফেসর ড. মিনাখিম এম. ব্রায়ার আরো বলেন, "টান্নাইটিক যুগে যে সমস্ত ইয়াহূদী মহিলা মাথা অনাবৃত রাখত তাদেরকে বেহায়া হিসেবে গণ্য করে ৪০০ দিরহাম করে জরিমানা করা হত"।

তিনি আরো বলেন, ইয়াহূদীদের এই হিজাব (পর্দা) শুধুমাত্র তাদের ভদ্রতারই পরিচায়ক হত না বরং, এটা বিলাসিতা ও পার্থক্যকারী বিবেচিত হত। হিজাব পরলে বুঝা যেত যে, এ মহিলা ভদ্র, উচ্চ বংশীয় এবং সে স্বামীর অধিকারভুক্ত পণ্য নয়।[79]

---

[78] Menachem M. Brayer, The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Psychosocial Perspective (Hoboken, N.J: Ktav Publishing House, 1986) p. 239.

[79] Ibid., pp. 316-317. Also see Swidler, op. cit., pp. 121-123.

হিজাব মহিলার সামাজিক মর্যাদারই পরিচয় বহন করে এবং তার মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা হিজাব পরত যেন তাদেরকে উচ্চ বংশীয়দের মতো দেখায়। হিজাব ভদ্রতার পরিচায়ক হওয়ার কারণে পুরাতন ইয়াহূদী সমাজে ব্যাভিচারী মহিলাদের হিজাব পরিধানের অনুমতি ছিল না। তাই, নিজেদেরকে সতী প্রমাণ করতে তারা বিশেষ ধরণের স্কার্ফ ব্যবহার করত।

ইউরোপের ইয়াহূদী মেয়েরা উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের জীবন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে মিশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পর্দা মেনে চলত। ইউরোপের সমাজব্যবস্থা অনেককে পর্দা খুলতে বাধ্য করেছে। অনেক ইয়াহূদী নারী তাদের মাথায় পরচুলা লাগিয়ে মাথাকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করার চেয়ে পর্দা বিধান পালন করাকে উত্তম মনে করেন। কিন্তু এখন অধিক ধার্মিকা ইয়াহূদী নারীরা

তাদের উপাসনালয় ছাড়া অন্য কোথাও চুল ঢেকে রাখেন না।[80]

তাদের কেউ কেউ এখনও পরচুলা ব্যবহার করে থাকেন।[81]

খৃষ্টানদের বিশ্বাস কি আসুন সেটা জেনে নিই। এটা প্রসিদ্ধ যে, ক্যাথলিক খৃষ্টানযাজক মহিলাগণ শত শত বছর ধরে পর্দা বিধান মেনে চলছেন। পর্দা সম্বন্ধে নতুন নিয়মে (new testament) পোল বলেছিলেন: "আমি চাই তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথাই যীশু। আর প্রত্যেক মহিলার মাথাই পুরুষ এবং যীশুর মাথা যেন স্রষ্টা। কোনো পুরুষ ইবাদত বন্দেগী করা অবস্থায় তার মাথায় কিছু থাকলে তার মাথাকে অপদস্থ করা হবে। পক্ষান্তরে কোনো মহিলা খালি মাথায় ইবাদত বন্দেগী করলে তার মাথাকে অপদস্থ করা হবে।

---

[80] Susan W. Schneider, Jewish and Female (New York : Simon & Schuster, 1984) p. 237.

[81] Ibid., pp. 238-239.

মাথাকে অপদস্থ করা মানে মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া। অতএব, কোনো মহিলা মাথা ঢেকে না রাখলে তার মাথার চুল কামিয়ে দিতে হবে। যদি কোনো মহিলার জন্য তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলা অপমানজনক মনে হয়, তাহলে সে যেন তার মাথা ঢেকে রাখে। আর পুরুষের মাথা স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি হওয়ার কারণে মাথা ঢেকে রাখা উচিৎ নয়। মহিলারা স্বামীর সন্মানের প্রতিচ্ছবি। কারণ, পুরুষ মহিলা থেকে নয়, বরং মহিলা পুরুষ থেকে। পুরুষ মহিলার জন্য সৃজিত হয় নাই বরং মহিলা পুরুষের জন্য সৃজিত হয়েছে। তাই ফিরিশতার খাতিরেই তার মাথার উপরে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। (১, করিন্থিয়ান্স: ১১/৩-১০)

পোলের পর্দা বিধান ঘোষণার মূল কারণ হচ্ছে- স্রষ্টারূপী পুরুষের সম্মান রক্ষা করা। কেননা পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্যেই তার জন্ম হয়েছে। বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটোলিয়ান তার বিখ্যাত গ্রন্থ “নারীর পর্দা” তে লিখেছেন: নারীদের উচিৎ রাস্তাঘাট, গীর্জা, নিজ ভাতৃবর্গ ও বেগানা পুরুষদের সামনে হিজাব (পর্দা) পরিধান করা।

বর্তমানেও ক্যাথলিক খৃষ্টানদের নিয়ম হচ্ছে- মহিলাগন গীর্জার ভিতরে অবশ্যই তাদের মাথা ঢেকে রাখবে।[82]

আমিশ, মিনোনাইট প্রমুখ খৃষ্টানগণ আজও হিজাব পরিধান করে থাকেন। পর্দা সম্বন্ধে গীর্জার পাদ্রীগণ বলে থাকেন যে, পর্দা হলো নারীর স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও স্রষ্টার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। এ কথাটা নতুন নিয়মে (new testament) পোল নিজেই বলে গেছেন।[83]

এ সমস্ত প্রমাণাদি দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, পর্দা ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত নতুন কোনো বিধান নয়। বরং ইসলাম শুধুমাত্র পর্দার বিধান পালনের জন্যে তাগিদ দিয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুমিন নারী ও

---

[82] Alexandra Wright, "Judaism", in Holm and Bowker, ed., op. cit., pp. 128-129

[83] Clara M. Henning, "Cannon Law and the Battle of the Sexes" in Rosemary R. Ruether, ed., Religion and Sexism : Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions (New York: Simon and Schuster, 1974) p. 272.

পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখা ও চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের বক্ষদেশের উপরে আবরণ ছেড়ে দিতে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ۝٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣٠، ٣١]

“মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন: তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতা স্বরুপ। নিশ্চয় তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে আল্লাহ তা‘আলা সম্যক অবগত। আর মুমিনা মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত করে রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন যা আপনা আপনি প্রকাশিত হয় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে; তারা যেন তাদের

বক্ষদেশের ওপর আবরণ ফেলে দেয়।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন জানিয়ে দিয়েছে যে, পর্দা নারীকে রক্ষা করে এবং তা তার সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চরিত্রের নিষ্কলুষতার প্রয়োজনীয়তা কি? আল কুরআন নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩﴾ [الاحزاب: ٥٩]

“হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার নারীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরের অংশ বিশেষ তাদের নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

চরিত্রের নিষ্কলুষতা নারীকে অনাকাংখিত পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়া থেকে রক্ষা করে। ইসলামে পর্দার বিধান প্রনয়ণের হিকমত তথা কারণ হচ্ছে- নারীর সুরক্ষা।

ইসলামে পর্দার বিধান খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরিত। ইসলামে এটা পুরুষের সম্মান বা তার আনুগত্যের দলীল নয়। এটা ইয়াহূদীদের আকীদা-বিশ্বাসেরও বিপরীত; ইসলামে এটা বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যকার পার্থক্যকারীও নয়। বরং তা প্রত্যেক মুসলিম নারীর সম্মান ও সচ্চরিত্রের গ্যারান্টি স্বরূপ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। যে নারীদের সম্মানের হানি ঘটাতে আসবে তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾ [النور: ٤]

“আর যারা সতী স্বাধ্বী মহিলাদেরকে অপবাদ দেয় অতঃপর চারজন স্বাক্ষী হাযির করতে না পারে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর; কখনও তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর ওরাই পাপাচারী।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪]

এবার তাহলে আসুন! আমরা আল কুরআনের এ শাস্তি ও বাইবেলের শাস্তির মাঝে তুলনামুলক বিশ্লেষণ করি। বাইবেলে এসেছে: “যখন কোনো পুরুষকে কোনো অবিবাহিত মহিলার (যার বিবাহের এখনও প্রস্তাব আসেনি) সাথে অশ্লীলতায় লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে তখন উক্ত পুরুষ, মহিলার পিতাকে ৫০ টি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করবে এবং তার চরিত্র হননের ফলস্বরুপ তাকে বিবাহ করবে; কখনও তাকে তালাক দিতে পারবে না। (ডিউটারনমী: ২২/২৮-৩০)

এখানে কাকে শাস্তিটা দেওয়া হলো? পুরুষকে যে জরিমানা স্বরূপ নারীর পিতাকে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা দেবে, নাকি উক্ত মহিলাকে যাকে উক্ত পুরুষের সাথে বিবাহ ও আজীবন ঘর-সংসারে বাধ্য করা হবে? কোনো বিধান

নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় অগ্রগণ্য, কুরআনের কঠিন বিধান না বাইবেলের লঘু শাস্তি?

পশ্চিমাদের কেউ কেউ “নারীদের রক্ষায় তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতার অবদান” নিয়ে রীতিমত ঠাট্টা বিদ্রুপ করে থাকে। তাদের দাবি হলো “নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বাধিক ভূমিকা রাখে শিক্ষা, শিষ্টাচার ও সভ্যতা”।

ভালো কথা কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। যদি সভ্যতাই নারীদের সম্মাণ ও মর্যাদা রক্ষায় যথেষ্ট হত, তাহলে কেন উত্তর আমেরিকায় নারীরা একাকী রাস্তায় বা নির্জন এলাকায় চলতে পারে না? আর যদি শুধুমাত্র শিক্ষাই তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে তাহলে, কুইন ইউনিভার্সিটির মতো প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন নারীদেরকে বিশেষ ব্যবস্থায় গন্তব্যে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়? শুধুমাত্র শিষ্টাচারই যদি তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারত, তাহলে আমরা প্রতিনিয়ত নারীদের ধর্ষণ ও উত্যক্ত করার মত যে সমস্ত ঘটনার সংবাদ পাচ্ছি তার অধিকাংশই কর্মস্থলে ঘটছে কেন?

বিগত কয়েক বছরের ধর্ষণ ও নারীদের সম্মানহানির যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে জড়িতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে: নৌবাহিনী, অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সিনেট সদস্য, উচ্চ আদালতের বিচারক, আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি। কুইন ইউনিভার্সিটির মহিলা বিভাগের ডীন কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট পড়ে আমি তো তা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। প্রকাশিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

প্রত্যেক ৬ মিনিটে কানাডায় একজন মহিলার ওপর আক্রমণ হয়।

কানাডার প্রত্যেক ৩ জন মহিলার মধ্যকার ১ জন এ আক্রমণের শিকার হয়েছে।

প্রত্যেক ১-৮ জন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণের শিকার হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় লেবেলের ৬০% ছাত্র অচিরেই এ ধরণের কাজ করবে।

যদি নিশ্চিত থাকে যে, তাকে এ কাজের জন্য অচিরেই কোনো শাস্তির সন্মুখীন হতে হবে না।

আজ আমাদের সমাজে ভুলপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে যার শিকড়সহ সংস্কার প্রয়োজন। পুরুষ ও নারী উভয়ের মান-সম্মান ও চরিত্রের নিষ্কলুষতার দাবী পোশাক, কথাবার্তা ও আচার-আচরণ প্রভৃতি সব কিছুতেই। অন্যথায় অবস্থা আরও বেগতিক হবে এবং মহিলাদেরকে আরও বেশি খেসারত দিতে হবে। এবং আমাদেরকে আরো বেশি দুঃখ পেতে হবে। খলীল জিবরানের একটা বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, “যে কোনো প্রকার সমস্যায় পতিত হয়েছে সে আর যে সমস্যার জরীপ করেছে তারা উভয়ে সমান নয়”।[84]

[84] Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989) p. 56.

আজ ফ্রান্স হিজাব পরিহিতা মহিলাদেরকে যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়ণ করছে তা তাদের নিজেদের দেশের জন্যেই বিপদ ডেকে আনবে।

বর্তমান যুগে যখন কোনো ক্যাথলিক খৃষ্টান মহিলা হিজাব পরে তখন তা সে স্বামীর সম্মানের জন্য পরিধান করেছে বলে পবিত্র গণ্য হয়; পক্ষান্তরে একই হিজাব যখন কোনো মুসলিম মহিলা তার নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পরে থাকে, তখন তা “নারীর ওপর অত্যাচার” বলে ধর্তব্য হয়।

শেষ কথা

অমুসলিমদের মধ্যকার যারা এ গবেষণার পুর্বেকার সংস্করণ পড়েছেন তাদের পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন করা হয়। সেটা হলো, ইসলামী সমাজে মুসলিম নারীদের সাথে কি এখন এ রকম ব্যবহার করা হয়? উত্তরটা খুবই দুঃখজনক ‘না’। এ প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছুটা আলোকপাত করব যাতে ইসলামে নারীদের অধিকারটা পূর্ণাংগভাবে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

মুসলিম বিশ্বে মহিলাদের সাথে কৃত ব্যবহারের পন্থায় একটা সমাজ থেকে অন্য সমাজ এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য থাকে। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধান সকল সমাজই পালন করে থাকে। অধিকাংশ মুসলিম সমাজই মহিলাদের সাথে ব্যবহারের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে, দুটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে।

এক. কট্টরপন্থি ও অন্ধ অনুকরণকারী।

দুই. স্বাধীন ও পশ্চিমাদের অনুকরণকারী।

প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা পুর্বকালের প্রাপ্ত রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে থাকে। এ ধরণের রীতিনীতির কারণে নারীরা ইসলাম স্বীকৃত অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে কোনো বিষয়ে পুরুষের থেকে মহিলাদের ওপর ভিন্ন ভিন্ন আইন কানুন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক রীতিনীতি চালু হয়ে গেছে। যেমন, পুত্র সন্তান জন্মের মত কন্যা সন্তান জন্মের

সময় তাকে স্বাদরে গ্রহণ করা হয় না। কখনও কখনও তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা বা উত্তরাধীকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। পুত্র সন্তান থেকে যে সমস্ত অযাচিত কাজকে মেনে নেওয়া হয় কন্যা সন্তান থেকে তা মেনে নেওয়া হয় না, তাদেরকে কড়া নজরদারীতে রাখা হয়। কখনও বা এ সমস্ত কাজকর্মের কারণে তাদেরকে হত্যা করা হয়। পক্ষান্তরে, একই কাজ করে পুত্র সন্তানেরা গর্ব করে থাকে। পরিবার বা সমাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করা হয় না। হয়তবা অনেক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদে বা বিবাহের উপহার ব্যবহারে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।

স্ত্রীরা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়াকে প্রাধান্য দেয় যাতে সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে কিছু মুসলিম সমাজ বা গোত্রে পশ্চিমা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এ সমাজগুলো সব কাজে পশ্চিমাদের রীতিনীতি ও কৃষ্টি কালচারগুলোর অন্ধ অনুকরণ করছে। এমনকি তাদের অসভ্য কালচারকেও বাদ দিচ্ছে না। এ

সমস্ত মডার্ণ সমাজের বিশেষ করে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা। সর্বদা তারা ব্যস্ত থাকে এবং গুরুত্ব দেয় তাদের নিজেদের সৌন্দর্য বর্ধন ও প্রদর্শনের কাজে। বিবেক-বুদ্ধির দিকে তাদের খেয়াল নেই। সমাজের জন্য কাজকর্ম বা কাজে শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে অপরকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতাকেই বেশি বড় করে দেখা হয়। তার ব্যাগে আর-কুরআন পাওয়া না গেলেও সর্বদা তাতে মেকআপ বা প্রসাধন সামগ্রী শোভা পায়। সে তার রূহানী সৌন্দর্যকে গোপন করে এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তার জীবন কেটে যায় নিজের নারীত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনুষত্বের দিকে নয়।

কেন মুসলিম সমাজ ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের ব্যাপারে কুরআনের শিক্ষা থেকে যুগ-যুগান্তরে মুসলিমদের দূরে থাকার ব্যাখ্যা দিতে গেলে আরেকটি গবেষণার প্রয়োজন হবে। মুসলিমদের যার ওপর থাকার দরকার তার ওপর

মুসলিমরা নেই এটা একটা প্রচন্ড সমস্যা। এ সমস্যা একদিনে আসেনি বরং তা যুগ পরম্পরায় দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে এ সর্বনাশী সমস্যার কুপ্রভাব জীবনের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্য, অনৈক্য, অর্থনৈতিক ধ্বস, সামাজিক যুলুম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরতা ও চিন্তাভাবনার মন মানসিকতা না থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত সমস্যার কারণে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইসলামের সাথে নারীদের যেন কোনোই সম্পৃক্ততা নেই। আগেকার নারীরা যেমন, ছিলেন বর্তমান যুগের নারীদেরকেও সেই স্থানে পৌছে দেওয়া এবং সমাজ সংস্কার করা অত্যন্ত আবশ্যক। আর এই সংস্কারের জন্যেও ইসলামের শিক্ষা মেনে চলা জরুরি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আজ মুসলিম বিশ্বে নারীদের এ লাজুক অবস্থানে থাকার কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভূল বুঝাবুঝি। মুসলিমরা সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে।

আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, এই গবেষণামুলক লেখাটির উদ্দেশ্য কিন্তু ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসকে খাট করার জন্যে নয়। ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী নারীদেরকে যে পজিশনে রাখা হয়েছে তা যুগের বিবর্তনে নিছক সামাজিকতা ও ইয়াহূদী-খৃষ্টান পুরোহিতদের নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার কারণে। এরা সমাজে নারীদের ন্যায্য অধিকার গুলোকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

বাইবেল যুগের আবর্তনে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা লিখিত হয়েছে। তাদের পারিপার্শিক অবস্থার ভিন্নতা ও মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে তাদের মতামত বিভিন্ন রকম হয়ে তাদের হাতে বাইবেল পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, পুরাতন নিয়মে বর্ণিত ব্যভিচারের শাস্তি নিয়ে মহিলাদের ওপর নির্ধারিত শাস্তি এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, তা সুস্থ বিবেক মেনে নিতে পারে না। তবে প্রাচীন ইয়াহূদী সমাজের লোকেরা নিজেদের বংশ দ্বারা গৌরব করত। এ জন্য তাদের চিন্তা ছিল কোনো নারী যেন অন্য কোনো শক্তিশালী গোত্রের

লোকদের সাথে কোনো ধরণের সম্পর্ক রাখতে না পারে। এ সমস্ত বিধানের সামনে আমরা সহানুভূতি দেখাতে পারি না। বরং আমাদের কাছে মনে হয় যে,এটা নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষদের একগেয়েমী ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়াও এটা ছিল নারীদের বিরুদ্ধে পুরোহিতদের নগ্ন হামলা ।নারীদের প্রতি গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বিতৃষ্ণ মনোভাবকে উল্লেখ করা ব্যতিত বিষয়টিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা ছাড়া আমরা ইয়াহূদী খৃষ্টান ধর্মের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে পারি না।

ইতিহাস ও মানুষের সভ্যতার ওপর ইসলামের অবদান বুঝতে হলে আমাদেরকে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাস জানা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন সভ্যতা ও সমাজ ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এটা হিজরতের পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে তাদেরকে আল্লাহর নবীমুসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর ওপর আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান পরিবর্তন করার পর্যায়ে পৌছে দিয়েছে। ইয়াহূদী

ও খৃষ্টান ধর্মে নারীদের ন্যায্য অধিকারের মধ্যে একগেয়েমি করার এ বিধান সপ্তম শতাব্দীর সে পরিবর্তনেরই উদাহরণ। তখনই মানুষকে অসৎ পথ থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার খোদায়ী বার্তা প্রেরণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তাদের ওপর আগত দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার জন্য রাসুল পাঠানো হয়েছে বলে ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧﴾

[الاعراف: ١٥٧]

“আর যারা অশিক্ষিত এই রাসুলকে অনুসরণ করেছে যাকে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পেয়েছে। তিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ ও

অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন,তাদের জন্য উত্তম জিনিসকে বৈধ ও অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেন,তাদের ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যারা তার ওপর ঈমান এনেছে, তার সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং তার সাথে নাযিলকৃত নূরের অনুসরণ করেছে, শুধুমাত্র তারাই সফলকাম।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]

অতএব, ইসলাম ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মের প্রতিদ্বন্দী হয়ে আসে নি, বরং আল্লাহ তাআলার পুর্ববর্তী বিধানসমূহকে পরিপূর্ণ করার জন্যেই এসেছে।

এ গবেষণার শেষভাগে আমি মুসলিম সমাজকে আবেদন করতে চাই যে, ইসলাম নারীদেরকে যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে তার অনেকাংশ থেকেই তারা আজ বঞ্চিত। যা পুরাতন হয়ে গেছে তার সংস্কার করা জরুরী। এটা প্রত্যেক মুসলমানেরই দায়িত্ব। মুসলিম বিশ্বের এটাও একটা দায়িত্ব যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে

নারীদের জন্য ঐক্যবদ্ধ একটা বিধান প্রণয়ন করবে। তাতে নারীদের ইসলামসম্মত যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করে যে কোনো মুল্যে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার বটে। তবে কোনো কিছু না করার চেয়ে দেরীতে হলেও কিছু করাই উত্তম। মুসলিমরা তাদের মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রীদেরকে যদি তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান না করে তাহলে, তাদেরকে সে অধিকার এনে দেবে কে? এছাড়াও আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত রীতিনীতি ও ভূল প্রচলন আমাদের মাঝে প্রচলিদ রয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক তাকে বর্জন করা। কুরআন কি আরবের কাফিরদেরকে তাদের পুর্বপুরুষদের কৃষ্টি-কালচারের অন্ধ অনুকরণ করার কারণে তিরস্কার করে নি? পশ্চিমা বা অন্য কোনো সভ্যতা থেকে আগত কোনো অশ্লীল প্রথা আমাদের মাঝে আসলে আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করব। তবে তাদের থেকে যেগুলো ভালো সেগুলো গ্রহণ করতে দোষ নেই।

তাদের সাথে সম্পর্ক রাখায় অসুবিধা নেই। এটাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣﴾ [الحجرات: ١٣]

"হে মানব সকল! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে একটি মাত্র পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; আর তোমাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক মুত্তাকী লোকই আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি সম্মানিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন।" [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

আমাদের কর্তব্য হবে আমরা অন্য কোনো জাতি বা গোষ্ঠির অন্ধ অনুসরণ করব না। কেননা এটা নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী কাজ।

আর ইয়াহূদী-খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইদের কাছে আমার কয়েকটি কথা রয়েছে। সেগুলো হলো: যে ধর্ম

নারীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করছে এবং তাদেরকে সম্মানের আসনে আসীন করছে, তাকে আজ নারীর ওপর যুলুমকারী বলে সাব্যস্ত করা হচ্ছে এটা আসলেই ক্ষুদ্ধ করার মতো কথা, যে বিশ্বাস আজ সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ বিষয় নিয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং মিডিয়া ও হলিউড সিনেমায় যা নিয়ে রীতিমত হৈ চৈ করা হয়। ইসলাম নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি ও কোনো কিছুর সাথে ইসলামের সম্পৃক্ততা নিয়ে ভীতিই এ ভুল বিশ্বাস স্থাপিত হবার অন্যতম কারণ। মিডিয়া ইসলামকে বিকৃতি করা থেকে ক্ষান্ত হলে আমরা শান্তিপুর্ণ সমাজ গঠন করতে পারব যেখানে থাকবে না কোনো ভুল বুঝাবুঝি, পক্ষপাতদৃষ্টতা ও সাম্প্রদায়িকতা। অমুসলিমদের জানা দরকার যে, ইসলাম স্বীকৃত বিষয় ও বর্তমান মুসলিমদের কাজকর্মের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এগুলো ইসলাম বলে স্বীকৃত হতে পারে না। সুতরাং আজকের মুসলিম সমাজে নারীদের মর্যাদা ও ইসলামে নারীদের মর্যাদার ভিতরে আকাশ পাতাল তফাত আছে ঠিক তেমনি, যেমন, তফাত আছে

ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মে নারীদের মর্যাদা ও পশ্চিমা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত নারীদের মর্যাদার ভিতরে। তাই মুসলিম অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের উচিৎ বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যত শান্তির লক্ষ্যে ভুল বুঝাবুঝি, ভীতি ও সন্দেহ ইত্যাদি দূর করার চেষ্টা করা।

আর এটা স্পষ্ট করা দরকার যে, ইসলাম নারীদেরকে সম্মান দিয়েছে এবং তাকে এমন সব অধিকার দিয়েছে, যা দেড় হাজার বছর পরে এখন সবেমাত্র বিশ্ব বুঝতে পেরেছে। ইসলাম নারীকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্মান-মর্যাদা ও সর্বপ্রকার বিপদ থেকে বেচে থাকার গ্যারান্টি দেয়। ইসলাম তাকে আত্মিক, বাহ্যিক, চিন্তা ও ইচ্ছাসহ সমস্ত প্রয়োজনকে মিটিয়ে দেয়। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, বর্তমানে বৃটেনে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে, তাদের অধিকাংশই মহিলা। অপরদিকে আমেরিকায়

ইসলাম গ্রহণকারী মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে চারগুন বেশি।[85]

তাই বর্তমান বিশ্ব সঠিক পথের দিশা পেতে ইসলামের অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। ১৯৮৫ সালের ২৪ শে জুন আমেরিকান কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগের এক বৈঠকে "রাষ্ট্রদুত হিরমান এইলটস" বলেছিলেন: বর্তমান বিশ্বে মুসলিমের সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশি এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই যে, ইসলাম একত্ববাদে বিশ্বাসী অত্যন্ত দ্রুত বর্ধমান একটি ধর্ম; এটা যদি কোনো কিছুর দিকে ইঙ্গিত দেয় তাহলে তা হবে - ইসলাম হলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। এটা প্রচুর সংখ্যক নেককার লোকদেরকে তার দিকে আকৃষ্ট করছে।"

---

[85] Khalil Gibran, Thoughts and Meditations (New York : Bantam Books, 1960) p. 28.

হ্যাঁ, ইসলাম সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রমাণিত হওয়ার সময়ও এখনই। আশা করি আমার এই গবেষণা এ পথে একধাপ এগিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ।

আরবী ভাষায় সহায়ক গ্রন্থাবলী

1- السيد سابق، فقه السنة (القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الحادية عشر، 1994)، المجلد الثانى-

2- أمير صديقى، دراسات فى التاريخ الإسلامى (كاراتشى: جمعية الفلاح، الطبعة الثالثة، 1967)

3- عبد الحليم أبو شوقة، تحرير المرأة فى عصر الرسالة (دولة الكويت:دار القلم،1990)4

4- عبد الرحمن دوى، المرأة فى الشريعة (لندن: مطابع طه، 1994)

5- محمد أبو زهرة، أسبوع الفقه الإسلامى (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون ،1963)

6- محمد الغزالى، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة و الوافدة (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الرابعة،1992)

ইসলাম নারীকে দিয়েছে যথার্থ সম্মান, ভূষিত করেছে প্রয়োজনীয় সকল অধিকারে, যা তাকে সম্মানিত ও তৃপ্ত জীবনযাপনে সহায়তা দেয় বর্ণনাতীতভাবে। পক্ষান্তরে বিকৃত ইয়াহূদী ও খৃষ্টবাদ নারীকে করেছে অনেক ক্ষেত্রেই অধিকার বঞ্চিত। মনোজ্ঞ উপস্থাপনায় এ বিষয়গুলোরই তুলনামূলক আলোচনা উঠে এসেছে বর্তমান গ্রন্থে।